মহামন্ত্র মহানাম

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৮শে অক্টোবর, ২০০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

ভারতে গণআন্দোলনের এক যুগান্তকারী মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক দুর্বিষহ যুগসন্ধিক্ষণে, সমাজ তখন প্রচণ্ড ভেদবুদ্ধির কবলে। সেই সময় মহাপ্রভুর ধর্ম-আন্দোলন দেশের মধ্যে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। অহিংসা, ত্যাগ, প্রেম, ভালবাসা ও মানবতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে মহাপ্রভুর মহান আদর্শের প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন ফেলেছিল। তিনি হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে দেখালেন এক নতুন আলোর পথ। তিনি প্রেম ভালবাসার মন্ত্র বিতরণ করে সাম্য মৈত্রী ও ভক্তির মহিমায় সকলকে দিলেন নতুন এক আধ্যাত্মিক চেতনা।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের ছোঁয়ায় জনচিত্তে যে ভক্তির জোয়ার এসেছিল, তা প্লাবিত হয়েছিল সমাজ জীবনের সর্বস্তরে। তাঁর প্রাণ ঢালা ভালবাসায় ছিল না কোন জাতি বিচার, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য ও হীনতার কোনরকম কলুষ কালিমা। তাঁর অমোঘ আহ্বানে ছিল প্রেম ভক্তি ভালবাসার দ্বারা সমাজ জীবন থেকে জাতিভেদ, বর্ণভেদ অপসারিত করে এক উদার ভাবধারায় অবহেলিত মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকারের কথা। একদিকে যেমন কোন বাধা প্রতিরোধ তাঁকে তাঁর প্রেম ভালবাসা ও ভক্তির পথ থেকে সরাতে পারেনি; তেমনি অপরদিকে তাঁর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা, যশ গৌরব কোনটাই তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তিনি ছুটে চললেন মহাকাশের দিকে তাকিয়ে দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে ''হরে কৃষ্ণ হরে রাম'' মহানামের ঝড় বইয়ে প্রেমোন্মত্ত হয়ে দিব্য জীবনের পথে। প্রজ্ঞা সূর্যের বিভায় মণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রেম, ভক্তি ও করুণার বার্তা তড়িৎ প্রবাহের মতো মানুষের মনে প্রাণে আজও চেতনা সঞ্চার করে।

মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত অচ্ছুৎ জনমানস মাথা তুলে দাঁড়াবার যে আলোর পথ পেয়েছিল, তা তখনকার সময়ে (বেশীরভাগ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে তারা নানা উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক অভিযোগ এনে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইল এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে অপদস্ত করে, এমনকি মেরে ফেলারও চক্রান্ত করলো। মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই ঘটনাচক্রে একদিন মাতুল (মামা) বিষ্ণুদাস ঠাকুরের কাছে এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, তিনি আবার তাঁর বংশে (মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশে) এয়োদশ উত্তরপুরুষে ভাগিনেয় রূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং এই জীবনের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্তপ্রতীকরূপে তাঁরই শেষ রক্ত বহন করে আবির্ভূত হয়েছেন, এ যুগের যুগত্রাতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাইতো তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সবাইকে আহ্বান জানালেন, হে পথিক, হে যাত্রিক অনন্ত জীবনযাত্রার পথে তোমাদের একমাত্র পাথেয় হচ্ছে মহামন্ত্র মহানাম। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ব শক্তিকে অর্জন করতে হলে, নিজেকে জেনে বিরাটকে জানতে বুঝতে হলে তোমরা নাম ও জপকে (বীজ মন্ত্রকে) আশ্রয় কর। যত বড় বড় মুনি ঋষি ও সত্য দ্রষ্টা মহান এসেছেন এই ধরণীতে, তাঁরা সবাই যে যাঁর নামে ও জপে বিভোর ছিলেন। সেই অগণিত নামের ধ্বনি, জপের সুর আজও আকাশে বাতাসে বয়ে চলেছে আপন সুরে।

মহাকাশের মহান তত্ত্বে ভরপুর এই মহামন্ত্র মহানাম। এই বীজমন্ত্রে আছে সমস্ত জগতের সারকথা। অনন্ত জগতের অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত ব্যাখ্যা, অনন্ত সুর; সব কিছুর সম্মিলিত ধ্বনি এই মহামন্ত্র মহানাম। এই ক্ষুদ্র বীজ দেহক্ষেত্রে পুঁতলেই মহীরুহে পরিণত হবেই হবে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, স্মরণ করলেই দেহবীণাযন্ত্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে এই মহামন্ত্র মহানাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অনন্ত ধ্বনি, অনন্ত সুর, যা আয়ত্ত করতে পারলে সবকিছুই নখদর্পণে এসে যাবে। তখন সকলেই হয়ে যাবে এক একজন ভগবান, এক একজন দেবতা। কারণ সন্তান বাবা মায়ের বীজ বহন করে আবার একদিন নিজেরাই বাবা মা হয়ে যায়। তেমনই ভক্ত ভগবানের বীজ। ভক্তের প্রাণেই থাকেন ভগবান। তাই ভগবানের জন্য মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় মাথা ঠোকার কোন প্রয়োজন হবে না।

মহাপ্রভু সেদিন দিয়েছিলেন মহামন্ত্র মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে নাম। তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত হিসাবে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ দিয়েছেন এ যুগের যোগ্য নাম রাম নারায়ণ রাম। মহাকাশের মহা সুরের তত্ত্বকে মন্থন করেই হয়েছে রাম নারায়ণ রাম। এই নাম যারা মুক্ত কণ্ঠে ভজন করবে, তাদের মাধ্যমে আসবে দেশের শান্তি, দেশের কল্যাণ। তারাই সমাজকে খুনী, জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোরদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে।

এই মহামন্ত্র মহানাম যখন উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে করতে সহস্র সহস্র

সন্তান মার্চ করে এগিয়ে যাবে, তখন কোথায় থাকবে মিলিটারীর Machine Gun, পুলিশের রাইফেল? গোলা-বারুদ, বন্দুক দেখবে, সব কেমন করে কি হয়ে যায়। শিব পার্বতী, মা কালী, সব দেবতারা এইভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বিভিন্ন স্তরের গুরু মন্ত্র হিসাবে একই শব্দ ব্যবহার করলেও কার মন্ত্রে কতটা কাজ হবে, তা নির্ভর করে গুরুর ক্ষমতার উপর। জন্মগত মহানের নিজস্ব মাত্রার জন্য তাঁর দেওয়া মন্ত্রটা বুলেটের মত কাজ করে। তাই আমাদের নামও জপের অস্ত্র নিয়ে চলতে হবে। 'মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ। ' আমাদেরও 'রাম নারায়ণ রাম' মহানাম নিয়েই দ্বারে দ্বারে যেতে হবে। দুর্বল জাতির সম্বল অস্ত্র; সবল জাতির সম্বল নাম। তাই নামই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র পাথেয়।

মহামন্ত্র মহানামের স্বাদ যাতে সবাই অনন্ত জীবনে চলার পথে পাথেয় করে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আর্শীবাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের দ্বাবিংশ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হলো **"মহামন্ত্র মহানাম"**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রী উত্তম চ্যাটার্জী, শ্রীমতী শর্মিলা চ্যাটার্জী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫ — *চপল মিত্র*

ইং ২৮শে অক্টোবর, ২০০৮ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
১০) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
১১) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯৮৩১৬৩২৫৬৭
১২) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১৩) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৪) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৫) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৬) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
১৭) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৮) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েন্ট এন্ড, জি.টি.রোড, আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমস্ত বিশ্ব জগৎ যে কারণে, যার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সেই শব্দটাই তোমাদের মন্ত্র

পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
২রা অক্টোবর, ১৯৬৬

তোমাদের দুটি ভাই হয়েছে (দীক্ষা নিয়েছে)। এরা বড় সাধক, পথিক। ডুবুরী চেন তো। সমুদ্রে মূল্যবান জিনিস খুঁজে বেড়ায়; ডুবুরী এরা। এরা শিলং হতে খুঁজছে। খুঁজে খুঁজে, খুঁজে পেয়েছে এই নর্দমার পাড়ে। পেয়ে কিছু নিয়ে নিল। আমি বলি, নর্দমায়ই সেন্ট থাকে। এরা কাল দার্জিলিং যাচ্ছে। আর একজন এসেছিল এদের সঙ্গে। সে বলে গেছে, এরকম একজন মহান ব্যক্তি যে এভাবে থাকতে পারেন, তা চিন্তা করা যায় না। দেখ, এরা কিরকম পোষাক পরে কি হয়ে গেছে। আজকে এই হল। প্রথম এক জায়গা হতে শুনেছে। আমারই শিষ্য হতে শুনেছে, আর কি। সে বলেছে, তুমি তো ভারতে যাচ্ছ। ভারতের এক জায়গায় তিনি আছেন, খুঁজে দেখতে পার। আগে সব বড় বড় জায়গায় খুঁজে দেখে পরে যাবে। সব জায়গায় গিয়ে দেখে, এক একজন যেন আছেন ময়ূর সিংহাসনে। কিন্তু অন্তরের তৃপ্তি কোথাও মেলেনি। আর এখানে দুর্গন্ধ। নাকে কাপড় দিয়ে এসে দেখে, দরজা বন্ধ।

এসে জিজ্ঞাসা করছে, 'বালক ব্রহ্মচারী থাকেন এখানে?' দরজা খুললে দেখে কোথাও কোন কিছু নেই, ঘর বাড়ী সংসার। আর একজন লোক সাথে ছিল, সে হলো টিবেটিয়ান। ওরা যেখানেই গেছে, যা চাইছে, পাচ্ছে না। **আমি বলি, 'বাবা, ক্ষেতির কাছে এসেছ বসো। কিছু পেলেও পেতে পার। দেখি, তোমাদের ভাল কিছু খোরাক দেওয়া যায় কি না।'**

ওরা মনে মনে ভাবছে, আতপ চালের ভাত হলে ভাল হতো। আমার এখানে আরেকজনের জন্য আতপ চালের ভাত রান্না হচ্ছিল। আমি একটা করে প্লেটে আতপ চালের ভাত দিলাম। ওরা তো আশ্চর্য। আতপ চালের ভাত দিয়ে আরম্ভ করলাম আর কাঁচকলা দিয়ে শেষ করলাম।

আজ এরা দ্বিতীয় দিন এল। ওরা অন্তরের মণির খোঁজে বেড়িয়েছে। ওরা মননের সুরে খনন করতে চায়। ওদের একটা মন্ত্র শিলং-এ দিয়েছিল। কানে দেয়নি। আর যেন কি বলেছিল, এটা যদি কেহ দিতে পারে, বুঝবে তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। বুদ্ধের বই থেকে এরা পায়। মঠের বই থেকে নেয়। ৪০টা মন্ত্র আছে। তার থেকে বেছে নিয়ে ওরা পরিব্রাজকের মত ঘুরছে। বুদ্ধ বলেছেন, এই মন্ত্র এই জায়গায় (কানে) যিনি দিতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত মহান। বুদ্ধের সেই বই-এর মধ্য হতে মন্ত্র নিয়ে পরিব্রাজক হতে হবে। জায়গায় জায়গায় ঘুরতে হবে। তারপর এটা যেখানে পাবে, তোমাদের মনের মতন মানুষ যখন পাবে, তাঁর নিকট হতে সেই মন্ত্র কানে পাবে। ওরা আমার খোঁজ পেল এক কনডাক্টর জাতীয় লোক হতে। বহু জায়গায় গেছে। কিন্তু আসল জিনিসের সন্ধান মেলেনি। এখন দার্জিলিং যাচ্ছে, আজকে এখানে এসেছে। আমি ওদের মন্ত্র বলে দিলাম। বলেছে, 'মিলে গেছে।' পেয়ে তো গেছে। এখন ভাবছি, কিভাবে ওদের আনন্দ মিলবে। তা করতে হলে তো ওদের পোষাক ছাড়াতে হয়। বাড়ী পাঠাতে হয়। সেভাবে এখনই কিছু বলিনি। ভাবছি, এই পোষাক রেখে কি করা যায়। এখন একটা যখন নিয়েছে যাক। ওটা নিয়েই থাক এখন। এখন উপরে গেছে। প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। ওদের নীচে নিয়ে এলাম। দেখ, তোমরা তো অনেক ভাই দেখেছ। এদের দেখ। এদের জানার আগ্রহ আছে। বুঝবার চেষ্টা আছে, স্পৃহা আছে। এরা জানতে চায়। আমি যেভাবে ইংরাজী বলি, জানতো? আমার সেই কঠিন ইংরাজী বুঝতে পেরেছে, বোধ হয়।

প্রঃ- ওদের নাকি স্পেশাল কিছু দিয়েছ?

উঃ- **এরা তোমাদের চেয়ে স্পেশাল জিনিস নিয়ে এসেছে। তোমাদের মত স্পেশাল নয়। ওদের স্পেশাল জিনিসের ম্যাসেজ নিয়ে এসেছে। আর তোমরা তো ওরিজিনাল পাওয়ারের। কোনটার দাম বেশী? অরিজিনালের দাম বেশী।** ওদের 'স্পেশাল' বলেছি বলে গায়ে লেগেছে?

আচ্ছা, ওদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু বলি। ওটা কিভাবে এল? ঐ মন্ত্র ওরা কিভাবে পায়? এই ব্যাপারটা ওদের মনে মনে থাকে। এটা ভিতরের খবর। এটা ওরা প্রচার করে না। কাজেই ওদের ভিতরে ভিতরে

থাকে। যারা সন্ন্যাস নেয়, তাদের ভিতরে থাকে। ভোজপাতা আছে। তাতে মন্ত্রগুলো লেখা থাকে। বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কতগুলি শব্দ পেয়েছেন। সেগুলো ধর ৫০টা মন্ত্র। ৫০টা পাতায় লেখা আছে। ওরা মন্ত্রলেখা পাতাগুলো বাতাসে রেখে দেয়। সেগুলি হাওয়ায় উপরের দিকে উঠতে থাকে। উড়তে উড়তে যখন দেখে আর ওঠে না, যেই পাতাগুলো থাকে, তার মধ্যে একটা পাতা খুলে যে মন্ত্রটা পায়, তখন ওটাই তার মন্ত্র হয়। সকলের মধ্যে এটা প্রচার করে না। নিজেদের মধ্যে থাকে। ফলে জানাজানি হয় না। ওখানকার যিনি হেড (প্রধান) তিনি বলেন, জায়গায় জায়গায় যে আশ্রম আছে, সেন্টার আছে, সেখানে তোমরা খুঁজে যাও। খুঁজলে বের হবে, তোমাদের মিলবে।

বুদ্ধ কি করেছেন। **বুদ্ধ প্রত্যেকটি মন্ত্রে কোটি কোটি জপ দিয়েছেন। ধর, এক একটি মন্ত্রের মধ্যে ৫০০ কোটি জপ আছে। এরকম ৫০টি মন্ত্রে ৫০০ কোটি করে জপ রেখে গেছেন। ৫০০ কোটি জপ যদি এক একটি মন্ত্রের মধ্যে থাকে, সেই মন্ত্রের দ্বারা অসাধ্যসাধন করা যায়।** বুদ্ধের এক একটি মন্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতা। বুদ্ধের এক একটা মন্ত্রের জপে বিরাট কিছু হতে পারে। এক একটি মন্ত্রে ৫০০ কোটি জপ, অদ্ভুত ক্ষমতা। বুদ্ধ যে আলোক দিয়েছেন, এই আলোকই জ্ঞান। ওঁর মন্ত্রগুলো সুর হয়ে যায়, পূর্ণ হয়ে যায়। গাছে যেমন ফুলটা যখনই ফোটে, গন্ধ বের হয়। এতটা গন্ধ তো কুঁড়িটাতে পাওয়া যায় না। এটা এরকম, বড় হয়ে ফুটলে, প্রস্ফুটিত হলে অনেক গন্ধ। আবার অনেক ফুল আছে, রাত্রে একরকম ফোটে, আবার দিনের বেলায় এইরকম আধফোঁটা। বুদ্ধদেব এইভাবে থাকতেন। অনেকসময় তিনি এরকম অর্ধস্ফুট, আবার অনেকসময় তিনি (বুদ্ধদেব) এরকম প্রস্ফুটিত থাকতেন। সেই অবস্থায় এই রকম এক একটা মন্ত্র রেখে গেছেন। সেই রকম একটা মন্ত্র ওদের ভাগ্যে উঠে গেছে। সেই মন্ত্র কানে যখন দিলাম, দুজনে হি হি করে হাসতে আরম্ভ করেছে।

ভাত যেমন দলা করে জানতো? অনেকগুলো ভাত মেখে দলা দেয় যে, পিণ্ডি দেয়, পিণ্ডি আছে না? তেমনই অনেকগুলি সূর্যকে একটা থালায় রেখে বুদ্ধদেব করলেন কি, ভাতের মত সবগুলিকে মাখলেন। মনে কর, এরকম অনেকগুলি ভাত মেখে দলা করলে যেমন হয়, যতগুলি ভাত,

ততগুলি সূর্য। এতগুলি সূর্য দলা করে এক একটা মন্ত্রে ঢুকিয়ে রেখেছেন। একটা সূর্যেরই তেজ এত। কাজেই এতগুলি সূর্যের দলার তেজ কিরকম হবে। এতগুলি সূর্য আসলো কি করে? এই যে সেন্টটা হয় গোলাপ ফুলের মধ্যে, কি কি জিনিস আছে গোলাপ ফুলের গন্ধে, কি কি বস্তু হতে সেন্টটা হয়, কোন্ কোন্ বস্তু দিলে গোলাপের গন্ধ হয়, সব ভাল করে জানতে হয়। কতভাগ জল, কতভাগ মিষ্টি, কতভাগ তিতা, ধর সাতটা পদ দিল— একমাত্রা, দুমাত্রা এরকম করে দিলে গোলাপ ফুলের গন্ধ হবে। সব পদগুলি মাত্রামাফিক একত্রিত করে যন্ত্র দিয়ে রিসার্চ করে গবেষণাগারে (Laboratory-তে) গাছ গোলাপের আতর তৈরী করলো। অনেকগুলো গোলাপের কারখানা করে ফেললো। গোলাপফুল বাদ দিয়েই গোলাপের আতর বের করতে আরম্ভ করলো। যেই মাত্রাতে সূর্য হয়, ধর ৩/৫, ৩/৮ এ সূর্য হয়। যেই যেই বস্তু হতে সূর্য হয়, সেই সেই বস্তুগুলো নিয়ে এসে জ্ঞানের আলো দিয়ে মাত্রাটা খুঁজে পেল। হাতের তালুতেও অনেকগুলো সূর্যকে একত্র করতে পারা যায় ঐ মাত্রায়। এতবড় রাইটার্স বিল্ডিং এতটুকু ফটোতে দেখলে বুঝা যায় না? যে লোকটা এতবড়, এতবড় দাঁড়ি, ফটোতে দেখলে মনে হয়, যেন শিশু। কাজেই এতটুকু ফটো যদি ক্যামেরাতে হয়, ঠিক তেমনই **একটা সূর্যকে যদি একটা সরিষার মত করি, তাহলে হাতের তালুতে অনেকগুলি সূর্যকে একত্রিত করতে পারবে না কেন? বুদ্ধ তাই করলেন। এতগুলি সূর্যকে একত্র করলেন। হাতের এক কোষের মধ্যে এতগুলি সরিষা, যতগুলি সরিষা ততগুলি সূর্য।** এককোষ সরিষা, মনে কর, দু'হাজার সরিষা পিষে আটফোঁটা তেল পড়লো। সেইরকম দু'হাজার সূর্য পিষে আটফোঁটা তেজ, আটফোঁটা আলো। এই ফোঁটা এক একজনের কানে দিয়ে দিল। বোঝ কি অবস্থা। সে আবার সেইভাবে দিয়ে যাচ্ছে। আবার সেই ফোঁটার সঙ্গে অভিজ্ঞতা না থাকলে কি করে হবে? একটা সূর্য হতে কতগুলি সৃষ্টি হয়। তেজ হতে কতগুলি সৃষ্টি হয়। সেই তেজের ভাণ্ডার হতে মন্ত্রগুলো এসেছে। কিন্তু এরা গোলমাল করে ফেলেছে। হ য ব র ল করে ফেলেছে। বুদ্ধদেব সত্যিকারের চেষ্টা করতে চেয়েছেন। তিনি যা চান, এরা সেইভাবে করতে পারছে না।

আমার বাবার কাছে একজন কাজ করতো। সে একটা গুলির মত পেয়েছে। যে চেনে, সে বলে, এটা তো মার্বেল নয়। সে তখন আমি যাকে

জ্যাঠামশাই বলে ডাকি, তাকে দেখাল। তিনি বলেন, 'এটা মার্বেল নয়। কলকাতায় গিয়ে দেখাও।'

তারপর জুটমিলের এক সাহেবকে মার্বেলটা দিয়েছে। সে কলকাতায় এসে তিন লাখ টাকায় বিক্রী করেছে। এরে বলে সাহেবের বাচ্চা। আমরা হয়তো পাঁচ টাকা দিতাম। মেমসাহেব তাকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী করে দিয়েছে। **তোমরা অরিজিনাল পাওয়ার পেয়েছো। আমি অরিজিনাল বলছি। তোমাদের অনেকগুলি সূর্যের দরকার নেই। সমস্ত বিশ্বজগৎ, সমস্ত ইউনিভার্স যে কারণে বা যার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, সেই শব্দটাই তোমাদের মন্ত্র।** তাই তোমাদের কোন গুণাতীত নেই। তোমাদের মন্ত্রটা কোন গণিতের গণনায় সীমানার মধ্যে পরে না। এটা কোন কোষের মধ্যে নেই। যেই পর্যন্ত ফাঁকা আছে, সেই পর্যন্ত আঁকা আছে। ফাঁকারও শেষ নেই, আঁকারও শেষ নেই। ফাঁকা আর আঁকা এক হয়ে গেছে। সমসুরে বাঁধা আছে, সমসুরে গাঁথা আছে। তোমাদের মন্ত্র আদিসুরের সঙ্গে গাঁথা আর বাঁধা। তোমাদের মন্ত্র আদির থেকে আনছে, আদিতে গিয়ে ফেলছে। আর ওটা (বৌদ্ধ মন্ত্র) আদিতে গিয়ে ফেলছে কোষ হতে। ওদের মন্ত্র ওরা নিজেরা একটা গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলেছে। গণ্ডীতে আবদ্ধ হবার ফলে পার্থক্য হয়ে গেছে। কাজেই সব ভাষা প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হতে পৃথক। প্রত্যেকটি ভাষা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যাওয়াতে এক একটা ভাষা, এক একটা জাতি। তোমাদের মাত্রা শূন্য হতে আনা হয়েছে। কোন পন্থীতে আবদ্ধ নয়। শূন্য হতে এনে মহার্ণবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রিসার্চ করে তোমাদের জন্য আনা হয়েছে। তোমাদের চিন্তাধারায় এটার শক্তি অসীম। এর শেষ নেই। ওরা যে প্রণালীতে জপ করছে, ওদের মালা আছে, কর আছে, তোমাদেরও আছে। তোমাদের সবই আছে। অসীম অনন্তে গিয়ে মিলেছে। তাই তোমরা সবসময় ব্যাপকতার সুরে থাকবে, কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

কীর্তন হচ্ছে জনজাগরণের একটি ধারা, একটি প্রধান পথ ও প্রেরণা

সুখচর ধাম
১০ই আগষ্ট, ১৯৭৮

কীর্তন কাকে বলে? কীর্তন বলতে কি বুঝা যায়? এর অর্থ কি? এতবছর ধরে যে কীর্তন চলে আসছে, কি ইঙ্গিত তার পিছনে আছে? কোন্ উদ্দেশ্যে এই কীর্তন হচ্ছে? এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কি? সাধারণেরা যেভাবে কীর্তন শুনে অভ্যস্ত, এখানকার কীর্তন সেই কীর্তন নয়। আজ এখানে যে কীর্তন হবে বা হচ্ছে, সাধারণতঃ তারা সেই কীর্তন শুনে অভ্যস্ত নয়।

কীর্তন হচ্ছে মিলন সঙ্গীত। কীর্তন হচ্ছে মিলনের সুর, যার মাধ্যমে সবার কণ্ঠ এক কণ্ঠে পরিণত হবে, এক ধ্বনিতে পরিণত হবে। কীর্তন হচ্ছে মিলন কেন্দ্র। বহুকে এক করে 'এক' হয়ে কাজ করাই কীর্তনের একটা মস্তবড় উদ্দেশ্য, মস্তবড় ইঙ্গিত। **মনের ক্লেদ সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া, ভিতরের আসুরিক বৃত্তি হতে রেহাই পাওয়া, ভিতরের উঁচুনীচু মনগুলোকে সমান করে সবার সাথে তাল দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া, সমস্যাকে সেই তালেই তালে এনে চালিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে।** কিন্তু সিদ্ধি, মুক্তি, অনুভূতি দর্শন— এই কথাগুলোর এখানে কতটুকু প্রয়োজন?

দর্শন, অনুভূতি, সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণের প্রয়োজনে যেভাবে যে ইঙ্গিতে এই কীর্তন কাজ করিয়ে নিচ্ছে তাতে প্রকারান্তরে এর ভিতরে এক হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে একনিষ্ঠাতে পরিণত হওয়ার মূল সুরটিই ধ্বনিত হচ্ছে। অনুভূতি, দর্শন বলতে কি বুঝা যায়? সাধারণতঃ দর্শন বলতে সকলে যেভাবে চিন্তা করে থাকে, এই দর্শন সেই দর্শন নয়। এই দর্শন হল প্রকৃতির বিষয়বস্তুকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন করা, দেখা। যাঁর দর্শন হয়, সে প্রকৃতির ভিতরে অনেক কিছু পেতে থাকে, যাতে প্রতিমুহূর্ত্তে মুগ্ধ হয়ে

থাকতে হয়। এটাই দর্শনের একটা বিষয়। তারপর আসে সিদ্ধি, নির্বাণ বা নির্বিকল্পের কথা। সিদ্ধি, নির্বাণ বা নির্বিকল্পের অর্থ কি?

সেই বস্তুতে (ধ্যেয়বস্তুতে) ডুবে থেকে সেই বস্তুর বস্তুত্বের সাথে গভীরতার সাথে সমস্ত বস্তুর বস্তুত্বকে প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে জেনে এবং জানাতে যিনি সক্ষম, তিনিই সিদ্ধ। সিদ্ধ অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এলেই এই অবস্থা হয়। এই অবস্থাতেই নির্বাণ বা নির্বিকল্প অবস্থাও আয়ত্তে এসে যায়। তখন সর্ববস্তুতে নিজেকেই খুঁজে পায়। শুধু খুঁজে পেয়েই শেষ হয়ে যায় না। সর্ববস্তুতেই নিজেকে অনুভব করতে থাকে। তাতে একটা গভীর শিক্ষা ও গভীর প্রেরণার সুর ভিতর থেকে আপনিই স্ফূরণ হতে থাকে। সেই কীর্তনের সুরে সবার সুর একত্রিত হয়। সকলের কণ্ঠ সমকণ্ঠ হয়ে এককণ্ঠে এসে যখন একসুরে পরিণত হয়, তখন সেইসুরে কীর্তন হতে থাকে। তাই প্রচলিত কীর্তনের সুর হতে এর সুর একটু ভিন্ন ধরণের। এতে ভিতরের অসুরের প্রতিপত্তি ও বাইরের অসুরের প্রতিপত্তি— উভয়তঃই অসুরের প্রতিপত্তিকে দমনের চিন্তা করা হয়েছে।

আজ এই অসুরদমনের কীর্তন অগ্রে হওয়া প্রয়োজন। সকলে সমকণ্ঠে সমতালে সমাজ থেকে অসুর তাড়াও। তোমরা সেই সুরে সুর দাও; সেই গান কর। তোমাদের শাস্ত্রে পুরাণে যে বিভিন্ন দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে, তোমরা দেবতাজ্ঞানে যাঁদের পূজা করে আসছো, তাঁরা সেই অসুরকেই বারবার করে তাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা ভিতরের আসুরিক বৃত্তিকে দমন কর। বাইরের অসুরকে বিতাড়িত কর। আজ এই কীর্তনেরই প্রয়োজন। এই কীর্তন হল সমস্ত কীর্তনের সার।

'রাম নারায়ণ রাম' মহাকাশের মহানামের মহা স্বরগ্রাম। মহাকাশের এই মহানামের মহা কীর্তন সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। যে কীর্তনে দল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, বিবাদ বিচ্ছেদের সৃষ্টি হবে, সেটি কীর্তনের পর্যায়েই পড়ে না। **রাম নারায়ণ রাম মহানামের কীর্তন হয় যেখানে, সেখানে থাকে না কোন সংস্কার। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সংস্কার বলে মনে হতে পারে। কারণ সংস্কারের ভিতর দিয়েই আমরা করেছি রাস্তা। সংস্কারকে হাতে নিয়ে সংস্কার মুক্ত করে এগিয়ে যাওয়াই যে আমাদের কাজ।** চারিদিকে দলে দলে

বিভিন্ন হয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যে কীর্তন করা হয়, এই কীর্তন সেই কীর্তন নহে। এখানে নাই কোন দল, সম্প্রদায়, নাই কোন জাতি, নীতির গন্ধ। কীর্তনের আর কোন অর্থ নাহিক মিলন ছাড়া।

সবার কণ্ঠে সমবেত সুরে একই মিলন সঙ্গীত। সেই মহামিলনের মহাধ্বনিই ধ্বনিত হয় রাম নারায়ণ রাম মহানামের কীর্তনের সুরে। **আধিপত্য করার লোভে কীর্তনের নামে নাম ভাঙিয়ে যারা নানা নামে, নানা দলে, নানা সম্প্রদায়ে করেছে ভাগ— সমাজে তারাই অপরাধী। তারাই অসুর পদবাচ্য। তাদের দমন করতে হবে। আমরা সেই কীর্তনই করি। সেই সুরের সুরধনীতেই অবগাহন করি। সেখানে নাই কোন ভাগ, নাই কোন বাদ, নাই কোন বিয়োগ। সেখানে আছে শুধু যোগ।** এই যোগাযোগের সূত্র ধরে যোগাযোগকে কেন্দ্র করে সকলকে একযোগে রাখার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই কীর্তন। যোগাযোগের অনেক অঙ্গের মধ্যে এটি একটি অঙ্গ। সুতরাং এই মিলনের যোগ থেকেই আমাদের যোগ আরম্ভ। এই যোগাযোগের যোগ যে যতবেশী করবে, কীর্তনের সফলতার দিকে সে ততবেশী অগ্রসর হতে পারবে।

তোমরা দল-সম্প্রদায় জাতিনীতি নির্বিশেষে সকলে এক ধর্মে, এক নীতিতে, এক সুরের বন্ধনে আবদ্ধ হও। সেই মহামিলনের মহা সঙ্গীত তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হউক। সেখানে থাকে না যেন কোন বিবাদ বিচ্ছেদ বা কোন জাতিগত নীতিগত ভেদ। তোমরা সবাই একই পঞ্চভূতের সন্তান। পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) কীর্তন করে করে সেই একতারই গান গেয়ে যাচ্ছেন। মহাকাশ থেকে, সৃষ্টির ধারা থেকে, এই সাড়াই ভেসে আসছে। পঞ্চভূত কী কীর্তন করছেন? 'তোমরা কেউ ভিন্ন নও। তোমরা সকলে একই ঔরসে একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান', এই ধ্বনিতেই পঞ্চভূত করছেন কীর্তন। সেই গানে সেই তানে তারা দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সতর্কতার ইঙ্গিত। পঞ্চভূত কেউ কারও ছাড়া নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামে নামাকরণ মাত্র।

জীবজগতের সৃষ্টবস্তু সকল একই বস্তু হতে আবির্ভূত; একই বস্তু হতে সৃষ্ট। শুধু নামাকরণের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। এই হ'ল

কীর্তনের মূল তত্ত্ব। কেউ যেন এতে ভুল না করে। এই মিলনের গান স্মরণে বরণে যেন চিরতরে থাকে মনে। সুতরাং সন্তানদলের সন্তানে নাই কোন দলগত ভাগ। 'দল' কথার মানে নহে দল বা সম্প্রদায়। বিশ্বের সন্তানগণকে, সন্তানবর্গকে নিয়েই এই সন্তানদল। তাই সব সন্তানের গোড়া, সব সন্তানের উৎপত্তি একই সূত্র থেকে, একই ধারা থেকে। আবহমানকাল থেকে সৃষ্টির ধারার ধারাবাহিকতায় সকলে একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং এখানে নাই কোন দলাদলির গন্ধ, নাই কোন তর্কবিতর্কের পালা। আছে শুধু 'রাম নারায়ণ রাম' মহাকাশের মহানাম। এই কীর্তনের গান সবাই কর। সেই সুর স্মরণ কর। সেটাই হবে তোমাদের জয়গান। সবাইকে জানাও সেই কথা।

কীর্তন হচ্ছে জনজাগরণের আর একটি ধারা, একটি প্রধান পথ ও প্রেরণা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অশান্তি, মনের ক্লেদ, পঙ্কিলতা, আবিলতা যেন কেটে যায় এই সুরের অমৃত পরশে। নদী ও সাগরের জল যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত আবর্জনা; নালা ডোবার জমানো সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতাকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের ভিতরের ক্লেদ পঙ্কিলতাগুলোও তেমনি কীর্তনের ধ্বনিতে, মহাকাশের মহাধ্বনিতে পবিত্র হয়ে যায়। রাম নারায়ণ রাম ধ্বনি মহাকাশের মহানামের মহাধ্বনি। মহার্ণবের প্রণবই এই কীর্তনের ধ্বনি। প্রণবের ধ্বনির সুরে গাঁথা গুরুগম্ভীর হুঙ্কারধ্বনি এই কীর্তনের সুরে অন্তর্নিহিত।

কীর্তনের তালে তালে রাম নারায়ণ রাম ধ্বনি উচ্চারণের সাথে সাথে ভিতরের সংকীর্ণতা, জমানো ক্লেদ পঙ্কিলতা আপনা আপনি ভেসে চলে যায়; হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি আসুরিক বৃত্তিগুলো হাল্‌কা হয়ে যায়। মহার্ণবের সুরধ্বনি ভিতরের সমস্ত আসুরিক বৃত্তিগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। আসুরিক বৃত্তিই যদি না থাকে, তবে অসুর জন্মাবে কোথা থেকে? ভিতরের আসুরিক বৃত্তি থেকেই তো বাইরের অসুরের প্রতিপত্তি। এই অসুর যত সৃষ্টি হবে, সমাজে অভাব অনটনও তত বেড়েই চলবে। লাঠি, ঠেঙ্গা, অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করে বাইরের অসুর সাময়িকভাবে দমন করা যায় কিন্তু তাতে ভিতরের অসুরের নাহি হয় দমন। ভিতরের অসুর দমন করতে প্রয়োজন রাম নারায়ণ রাম মহাকীর্তন। এই কীর্তনের সুরের সাগরে সব অসুর ভাসতে থাকবে। মহার্নবের সুরধ্বনির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভিতরের আসুরিক বৃত্তিগুলি

চিরতরে ভেসে চলে যাবে। এই **রাম নারায়ণ রাম শব্দধ্বনি এমনই ধ্বনি, যা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে ঢেউয়ে ঢেউয়ে মহাকাশের অনুপরমাণুর মধ্যে এ্যাটমিক Action হতে থাকে। এতে ভিতরের বিষ, বাইরের বিষ, উভয় বিষই বিনষ্ট হয়ে যায়।** দেশ ও জাতি সকলের রক্ষাকল্পে এই বিষ বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন। 'রাম নারায়ণ রাম' এই মহানাম অসুর দমনের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এটি মহাকাশের মহা স্বরগ্রাম। এই মধুর নাম যে কতবড় সুরে গাঁথা, সকলে সমবেত সুরে কীর্তন করলেই তা বুঝা যাবে; সেই ফল পাওয়া যাবে।

মহাপ্রভু গেয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম অসুর দমন করতে। তোমরাও করবে উচ্চৈঃস্বরে রাম নারায়ণ রাম অসুরদমনকল্পে। শিব নিজ হাতে লিখলেন রাম নারায়ণ রাম। তিনি নেমে গেলেন মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সপ্তচক্রের বর্ণনা নিয়ে। তোমরা যখন মার্চ (March) করে যাবে, **উচ্চৈঃস্বরে রাম নারায়ণ রাম মহানাম কীর্তন করতে করতে সহস্র সহস্র সন্তান আমরা যখন march করে যাবো, কোথায় থাকবে মিলিটারীর Machine Gun, কোথায় থাকবে পুলিশের রাইফেল, কোথায় থাকবে অন্য কিছু।** শিব, মা কালী, পার্বতী এই মহানামকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সব দেবতারাই এইভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা ভয় পেয়ো না। **মৃত্যুকে ত্রিশূলের ডগায় রাখ। ত্রিশূলের প্রাণ আছে, জানো ত? রাম নারায়ণ রামেরও প্রাণ আছে। গোলা, বারুদ, বন্দুক দেখবে সব কেমন করে কি হয়ে যায়। তোমরা এগিয়ে যাওয়ার পথিক, এগিয়ে যাও।** তোমরা এতদিন পর্যন্ত যা করেছো, সব ভুল। তোমরা সমাজকে শোষণের যন্ত্র করেছো।

আমরা ন্যায়ের পূজারী। আমরা রাজনীতি চাই না, খুন চাই না। আমরা চাই দিলের সেবা। আমরা চাই সমাজের পরিবর্তন। আমরা চাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। সব শাখাকে, সংগঠনকে এক শিকলে বেঁধে দেবো। তোমাদের সাথে কেউ পারতে পারে না, পারে না। ২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মন্ত্র তোমাদের রাম নারায়ণ রাম। শিব এইভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত দেবতারা এইভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের মুখে থাকবে রাম নারায়ণ রাম। হাতে ত্রিশূল। আমাদের লড়াই অসুরদের বিরুদ্ধে। আমরা এই কীর্তন করবো। মহাকাশের আদিসুর, মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম' নিয়েই আমরা পথ চলবো। রাম নারায়ণ

রাম।

আমরা বেদপ্রচারক। কর্মী হয়ে এসেছি। আমরা কর্ম করবো। কর্মই আমাদের ধর্ম। সুতরাং আমরা চাই সেই সুর। চাই অসুর দমন করতে। আমরা এগিয়ে গিয়ে কারও সাথে ঝগড়া করতে যাব না। লক্ষ লক্ষ সন্তান, যারা মরতে পারে, মারতে পারে, তাদের নিয়েই এগিয়ে যাব। শাখা প্রশাখায় সর্বত্র সন্তান বাড়িয়ে চল। তোমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছ, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। কারও বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা নাই। আমাদের সমালোচনা অসুরদের বিরুদ্ধে। আমরা তৈরী হয়ে থাকবো। আমরা শুধু দেখবো, কে কি করছে, না করছে। আক্রমণকারীকে আক্রমণ করবোই। সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কথা নেই। আমরা অনেকদিনের ভুক্তভোগী। এবার আর ছাড়বো না। সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা কাজ করবো। আমি যদি দেড় কোটি লোক লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে নামিয়ে দিই, তাহলে সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাবে। সমাজের অভাব সৃষ্টির মূলে যারা, তাদের বিষদাঁতগুলো ভেঙে দিতে হবে। তোমরা শাখায় শাখায় সব ভাইবোনেরা এক শিকলে থেকো। তোমরা মাটির মানুষ মাটি হয়ে থাকো। বাতাস আর জল যদি ঝগড়া করতো, তাহলে আমরা একযোগে মরে যেতাম। খালি নিন্দা, সমালোচনা, পরচর্চা, এছাড়া তোমাদের তো আর কোন Capital নাই। আমার রক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রক্ত, ভুলে যেও না। আমি ভগবানের বাবা হয়েছি। আবার প্রচুর বদনামও নিয়েছি। কৃষ্ণের শত নাম ছিল, জানই তো। **যত ঝড় আসুক, আমার সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে আমি যেন ঝড়ের বিরুদ্ধে তরী ভাসিয়ে যেতে পারি। রাম নারায়ণ রাম। তোমরা সেইভাবে সেই মন নিয়ে কাজ করে যাও। আমি তোমাদের সাথে আছি।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জীবনযাত্রার পথে একমাত্র পাথেয় হচ্ছে মহামন্ত্র মহানাম

সুখচর ধাম
২৩শে জুন, ১৯৭১

শিশু বয়স থেকে যে সুর জেনেছি, যে পথের সন্ধান পেয়েছি, যে অনন্ত গতির পথে গতিময় হয়ে চলেছি, আমি সবাইকে সেই পথের পথিক করে নিয়ে যেতে চাই। সে পথ সম্পূর্ণ গাণিতিক নিয়মে বাঁধা, যুক্তির উপর নির্ভরশীল। এখানে কোন গল্প কল্পনা বা অবান্তর কথার স্থান নেই। সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই নাম ও ধ্বনি আকাশে বাতাসে সর্বত্র বিরাজমান। **যত বড় বড় মুনি ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা মহান এসেছেন, তাঁরা সবাই যে যাঁর নামে জপে বিভোর হয়ে রয়েছেন। সেই অগণিত নামের ধ্বনি আজও আকাশে বাতাসে বয়ে চলেছে আপনমনে আপন সুরে।** এই পরিদৃশ্যমান জগতের সবকিছু আমাদের বোধে এনে আপনসত্তায় উপলব্ধিতে ভরপুর করে নেবার জন্যই মহানরা দিয়ে গেছেন নাম বা ধ্বনি। সেই ধ্বনিতে ধনী হয়ে সব কিছু জেনে ও বুঝে নিতে হবে। নাম ও জপের মাধ্যমেই তা আয়ত্ত করতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে নামের ভিতর দিয়ে, কীর্তনের ভিতর দিয়ে শ্বাসে প্রশ্বাসে টেনে নিতে হবে সেই ধ্বনি ও সুরকে, আকাশে বাতাসে যা ভাসমান অবস্থায় রয়েছে; যাকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে এই জীবজগৎ।

লক্ষ লক্ষ লোকের কথাবার্তার সম্মিলিত সুর যেমন দূর হতে শুনলে মনে হয় একটা গুম্ গুম্ ধ্বনি, তেমনি বিশ্বের সকল শব্দের সম্মিলিত সুর ও সাড়াই হচ্ছে মন্ত্র। জপের মাধ্যমে এই মন্ত্ররূপ ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করলে অন্তর্নিহিত সকল সুর ও সাড়া জেগে ওঠে। কীর্তন হচ্ছে এক মহা মিলন সঙ্গীত। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমসুরে সমভাবে একই নাম উচ্চারণ করলে সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ নাম জপের কাজ হয়ে যায়। দেহের ভিতরের লক্ষ লক্ষ অনু পরমাণু সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ নামের খোরাক (খাদ্য) পেলে, তারাও ঐ একই বোলে বোল দিতে থাকবে। সবাই একত্রিত হয়ে মৃদঙ্গ ও করতাল

বাজিয়ে কীর্তন করতে করতেই ভিতরের সুর ও সাড়া জেগে ওঠে। আবহমান কাল হতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় একটাই সুর ভেসে আসছে, ''একই মহাকাশ হতে এসেছ সবাই। একই প্রকৃতির সন্তান তোমরা। কেউ ভিন্ন নও।'' এই ভাব, এই সমভাবই হল নাম কীর্তনের মূল তত্ত্ব।

জীবনযাত্রার পথে আমাদের একমাত্র পাথেয় হচ্ছে মহামন্ত্র ও মহানাম। অল্প সময়ের মধ্যে শক্তি অর্জন করতে হলে, নিজেকে জেনে বিরাটকে জানতে ও বুঝতে হলে নাম ও জপকেই আশ্রয় করতে হবে। গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রই হচ্ছে বিরাটের সেই বিরাট শক্তি, বিশ্বের সেই আদি শব্দ, যাকে আশ্রয় করে জীবজগতের সৃষ্টি। অহর্নিশ শ্বাসে প্রশ্বাসে সেই নাম মহানাম জপ করে গেলেই প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারবে।

ধ্বনি ছাড়া কোন কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে না। যেখানে গতি সেখানেই ধ্বনি। Sound না হলে motion বা movement হতে পারে না। এটাই বিশ্বপ্রকৃতির মূল নীতি, fundamental law. Sound-এর উপর base করেই speed হচ্ছে। speed-ই speed-কে maintain করছে। Speed বা গতিই হচ্ছে জীবের জীবন। ধ্বনি (sound) থেকেই জীবন। সেটাই আবার energy বা matter. Sound যত বাড়বে, যত ধ্বনির চর্চা হবে, Speed তত বাড়বে। যেখানে পরিবর্তন, যেখানে গতি, সেখানেই sound বা ধ্বনি। ধ্বনি আছে বলেই, ধ্বনিকে অবলম্বন করেই রূপান্তর হচ্ছে। ফুল যে ফুটছে কুঁড়ি থেকে, সেখানেও motion আছে। অনুপরমাণুর motion চলেছে। ফুলের ধ্বনিটাকেই আমরা দেখছি ফুলরূপে। যেখানে যা কিছু হচ্ছে, ধ্বনিকে base করেই হচ্ছে। ধ্বনিই গতির পথে টেনে নিয়ে যায়, ধ্বনিতে পরিণত করে। ধ্বনি হতেই বস্তু হয়। ধ্বনি আবার ধ্বনিতে ফিরে যায়। মন্ত্রই হল ধ্বনি। তাই মন্ত্রের এত প্রয়োজনীয়তা।

মন্ত্রই হচ্ছে সেই আদিসুর, মূলাধারে যা রয়েছে সহজাত। জানার আগ্রহে ব্যাকুলতা নিয়ে সেই সুরকে সুরে আনতে হবে নাম ও জপের মাধ্যমে। মন্ত্রের চর্চায় চর্চায় ধ্বনির প্লাবন যখন শুরু হবে, যার যার ভিতরে একটা মধুময় সুর বাজতে থাকবে। সেই সুরে থাকবে তন্ময়তা ও মাদকতা।

মন্ত্রের ধ্বনি তোমাদের তখন বিভোর করে দেবে। দিগ্ দিগন্তে যে মহানন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, সেই মহানন্দের ঢেউ তখন বইতে থাকবে ভিতরে। ভিতরের লক্ষ কোটি অনু পরমাণু মন্ত্রের ধ্বনিতে ধ্বনিময় হয়ে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে। অন্তর্নিহিত সেই সহজাত শক্তি, সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তখন জেগে উঠবে, যা রয়েছে মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে। শক্তির স্ফূরণের সাথে সাথে এক বিরাট আনন্দে মন ভরপুর হয়ে যাবে। এটাই হল শাস্ত্রে বর্ণিত সেই চিদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। সেই সুরধ্বনিকে জাগাবার জন্য, শক্তির স্বাভাবিক স্ফূরণের জন্যই মহানাম ও জপের ব্যবস্থা।

মুক্তভাবে মুক্তচিত্তে সদাসর্বদা বীজমন্ত্র জপ করলেও যেমন কাজ হয়, তেমনি উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করলেও কাজ হয়। নাম আর বীজ (মন্ত্র) হচ্ছে, যেন চাল আর ধান। ধান পুঁতলে গাছ হয়, চাল পুঁতলে গাছ হয় না। আবার চাল না হলেও চলে না। কিন্তু ধান না পুঁতলে তো চাল পাওয়া যাবে না। ধান যদি থাকে, তবেই চাল পাওয়া যায়। তাই দুটোই চাই— জপও চাই, নামও চাই। ধানে (বীজমন্ত্রে) ধ্যান দাও। ধানে (বীজমন্ত্রের ধ্যানে) জপ করে যাও। বীজটা, বীজধানটা সবাই গোপনেই রাখে। তাই জপ করবে মনে মনে। কিন্তু নাম সবসময় উচ্চৈঃস্বরে করতে হয়।

সবাই একত্রিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করলে সেই ধ্বনি যার কানে যাবে, সেই অদ্ভুত ফল পাবে। নাম যদি প্রবল হয়, তবে দৈনন্দিন জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সব বিনাশ হয়ে যায়। আগুনে যেমন সব পুড়ে যায়, সেইরকম মনের ক্লেদ পঙ্কিলতাগুলো সব 'নামে' নষ্ট হয়ে যায়। তাই সবসময় নাম করতে হয়। হাজার হাজার মানুষ একসুরে নাম করলে সেই নামে হাজার হাজার নামের কাজ একবারেই হয়ে যায়। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্তন করে বেড়িয়েছেন, আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন। খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামে গঞ্জে নগরে নগরে কীর্তনের পথটি তিনিই প্রশস্ত করে দেন।

আমাদের দেহের মধ্যে কোটি-কোটি জীব আছে, কোটি কোটি অনুপরমানু আছে। তাদের প্রত্যেকটির মাঝেই আমাদের মতো ব্যক্তিত্ব

আছে, চৈতন্য আছে, জ্ঞান ও বুঝ আছে। তারাও দর্শন ও মুক্তির কামনা করে। তাই অজস্র নাম না করলে ভিতরের সেই লক্ষ কোটি জীব কণিকাগুলো প্রত্যেকে মুক্তির স্বাদ পাবে না। এজন্য বেশী করে নাম করতে হয়। এটা সহজে হয় কীর্তনের মাধ্যমে। হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একসুরে নাম করলে সেই নাম তোমার কানে গেলে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার হাজার হাজার নাম করা হয়ে যাবে। ভিতরের লক্ষ কোটি কণিকা সেই স্বাদে জেগে উঠবে। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্বনিতে ধ্বনিতে নাম হতে থাকলে শরীরের ভিতরের কোটি কোটি কণিকা সুরে ভরপুর হয়ে যাবে। তাই আপনমনে জপ করে যাও, মহানাম করে যাও।

ঠিকমত ধ্বনি দিতে পারলে বাঘের ডাকে বাঘ, শেয়ালের ডাকে শেয়াল, বেড়ালের ডাকে বেড়াল ও পাখীর ডাকে সেই পাখী ঠিকই সাড়া দেয়। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুরে সুর মিলালে সেখানকার সবকিছু একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠবে। **মন্ত্র হচ্ছে Mixture-এর মতো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত বস্তুর অগণিত ধ্বনির সংমিশ্রণে মিলিত সুরের সারই হল মন্ত্র। এই সুরেই আছে সকল বস্তুর সাড়া। এই ধ্বনি বারবার ধ্বনিত হলে বিশ্বের সকল বস্তুই সাড়া দিতে বাধ্য। মন্ত্রের অর্থ ও শক্তি যে কত বিরাট, তখনই তা উপলব্ধিতে আসবে।**

শব্দধ্বনির সার যে মন্ত্র, সেটাই হচ্ছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের খোরাক (খাদ্য)। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়; প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বিরাট। প্রচণ্ড এদের ক্ষুধা; এদের জানবার, বুঝবার, শুনবার ও দেখবার স্পৃহা অসীম। ছোট দুটি চোখে কোটি কোটি মাইল দূরের বস্তুর আভাষ মেলে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বেলাতে একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাই সেভাবেই তাদের খোরাকও যোগাতে হবে। যেভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের খোরাক দিচ্ছি বৃত্তির নিবৃত্তির মাধ্যমে, তাতে তাদের (ইন্দ্রিয়গুলির) পেট ভরে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তারা তাদের উপযুক্ত খোরাকের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অনুভব শক্তিতে জগতের সকল বিষয়বস্তুর মিলিত সুরের সাড়া (মন্ত্রধ্বনি ও মহানাম) না দিলে তাদের ক্ষুধা মিটবে না, মিটতে পারে না। তাই সেভাবেই তাদের ধ্বনির খোরাক, মহানামের খোরাক দিতে হবে। সেটা

সম্ভব একমাত্র অহর্নিশ বীজমন্ত্র জপ ও মহানাম স্মরণের মাধ্যমে।

মহাকাশকে মন্থন করে বিরাট ও ব্যাপক অর্থবোধে মহাকাশের মহান অর্থের সার হিসাবে দেওয়া হ'ল মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের অর্থ বিরাট। 'রা' হচ্ছে মুক্তাকাশের মুক্তবাণী। 'ম' হচ্ছে মহাকাশের মহাবাণী, আদিবাণী। ''নারায়ণ'' হচ্ছে অনন্তবিশ্বের সুরের সাথে যে সুর গেঁথে আছে এবং তোমার ধ্বনির সাথে যে সুর একসুর দিয়ে গাঁথা। 'নারায়ণ' হচ্ছে অনন্ত মহাকাশে যাঁকে আনয়ন করেছ, আহ্বান করেছ, আয়ন করেছ, তিনিই নারায়ণ।

নীল আকাশের নীলবর্ণ, কৃষ্ণাকাশ। তাই মহাকাশই মহাকৃষ্ণ। এই মহাকাশের মহাকৃষ্ণ সেই বিরাট বিশালতার মাঝে বিরাজ করছেন। সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য এসবই তাঁর (কৃষ্ণরূপ মহাকাশের) বংশ, বিরাট বংশ। সেই বিরাট বংশের বাঁশী বাজালেন নীল আকাশের মহাকৃষ্ণ। বাজালেন সেই বংশের বাঁশী। এটি আমাদের দেশের বাঁশের বাঁশী নয়। সেই বাঁশী হ'ল অনন্ত বংশের (গ্রহ, নক্ষত্রাদি সৃষ্টির) বাঁশী। সেই বাঁশীতে কার সাথে যোগাযোগ সূত্রে যুক্ত? এখানকার প্রেম করে রাধা নয়। সেই প্রেম হল ধারা, প্রেমের ধারা, গ্রহ নক্ষত্রাদি সৃষ্টির ধারা। অনন্তধারার সাথে যুক্ত হলেন কৃষ্ণ। তাই মহাকাশই হলেন মহাকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর ধারার থেকে হ'ল ধরিত্রীর সৃষ্টি। ধারা ধারা বারবার বললে হয় রাধা। আর মহাকাশকে কৃষ্ণ বললে হয়ে যায় কৃষ্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির ধ্যানধারণার মাঝে সেই বিশালতাকে নিজের ধারণায় যাতে সহজপথে আনা যায়, তারই প্রচেষ্টায় হল রাধাকৃষ্ণ।

মহাকাশের ধারাবাহিকতার ধারাপাতায় রয়েছে রা, ম। 'রা' হচ্ছে মহাকাশ। 'রা'-র মধ্যে রয়েছে স্বরগ্রাম সা রে গা মা পা ধা নি সা। 'ম'-র মধ্যে রয়েছে মহাকাশের মহাশক্তির বিবরণ। 'নারা'-র মধ্যে রয়েছে, আহ্বান। আয়ন করছে অর্থাৎ আহ্বান করছে। সেই ''নারা'' অনন্ত ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে 'না'-এর মধ্যে। সা রে গা মা পা ধা নি; নি-না। সেই 'নি-না'র মধ্যে রয়েছে মহাকাশের 'নারা'। আয়নের মধ্যে রয়েছে আবাহন এবং তার যে মূলতত্ত্ব মূল আকাশ। **নারায়ণ হচ্ছে বিগ্রহ। তাঁর নাক নাই, চোখ নাই, মুখ নাই, একটি**

গোল বস্তু। সেই গোল বস্তু হচ্ছে মাথা। মাথা গোল আর আকাশকেও গোল দেখা যায়। আর প্রকৃতি বিকৃতি সবই গোল। তাই সেই গোলাকারের মধ্যে গোল বস্তুতেই রয়েছে মহাশক্তি আধারস্বরূপ। সেই আধারকে নবরূপে সৃষ্টিরূপে আয়ন রূপে আহ্বান করলেন। কাকে আহ্বান করলেন? সেই নারায়ণকে। তাঁকে নীল আকাশের নীল বর্ণের সাথে যুক্ত করলেন। তাই 'রাম নারায়ণ রাম' এই মহানামের মধ্যেই অন্তর্নিহিত হয়েছে মহাকাশের অনন্ত সুর, অনন্ত শক্তি।

'রাম নারায়ণ রাম' এই কথা বললে সর্ব কথা বলা হয়। 'রাম নারায়ণ রাম' এই কথা বললে সর্ব কথা জানা যায়। বেদজ্ঞরা, ঋষিরা, দেবতারা দুই বাহু তুলে বললেন, ''তোমরা সবাই দুই বাহু তুলিয়া বলো, 'রাম নারায়ণ নাম।' এই কথা বলতে বলতে তাঁরা আকাশের গতিতে, আকাশের গতির পথে, আকাশ পথে চলতে চলতে দেখলেন, সর্ব আকাশটা যেন হয়ে আছে 'রাম নারায়ণ রাম'। যেদিকে যান, যেদিকে তাকান, সবদিকেই দেখেন, 'রাম নারায়ণ রাম'। মহাকাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন সব জায়গাটি ফাঁকা। আবার 'রাম নারায়ণ রাম'-এর বর্ণনা যখন খুঁজতে লাগলেন, দেখলেন সবই আঁকা (মহাশূন্যে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জ)। এই আঁকা এবং ফাঁকার মাঝেই সব। আঁকা এবং ফাঁকা একই কথা। এইভাবে সমস্ত পৃথিবীতে বেদজ্ঞরা, দেবতারা, ঋষিরা জানিয়ে দিলেন, একমাত্র কথা একটি কথা আছে, 'রাম নারায়ণ রাম।' পৃথিবীর মুক্তি, জীবের মুক্তি; এতেই রয়েছে সবার মুক্তি। এক এক আসনে বসে আছ যারা, সদাসর্বদা শুধুমাত্র বলো, 'রাম নারায়ণ রাম'।

এই যে ফাঁকা আকাশে মেঘ-গর্জন হচ্ছে এই গর্জনই হচ্ছে ধ্বনি বা নাদ। সকল সৃষ্টির মূলেই রয়েছে এই নাদধ্বনি। সমস্ত আকাশটাই ধ্বনিময়, (শব্দগুণকম্ আকাশম্)। সমস্ত বিশ্বটাই নাদ। এই ধ্বনিকে কেউ সৃষ্টি করেনি। ফাঁকা বা মহাশূন্যের মত ধ্বনি চিরকালই ছিল, বরাবরই থাকবে। কোন ধ্বনি বা শব্দই নষ্ট হয় না। আমরা শুনতে পাই না বলেই যে তা নেই, তা ঠিক নয়। সমগ্র জগৎটাই ধ্বনিময়। এই ধ্বনিকে আশ্রয় করেই চলতে হবে চলার পথে। ধ্বনির সাধনা করতে করতেই সেই সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সুর জানলে সবকিছু জানা যায়। **সবকিছুর মূলেই রয়েছে সুর বা ধ্বনি। সুরই চৈতন্য, যার দ্বারা সবকিছুর সৃষ্টি। অতি সহজেই যাতে জীব আদিসুরকে**

সুরে আনতে পারে, তারজন্যই বেদধ্বনি।

সুর দিতে দিতেই বেদজ্ঞরা এই পৃথিবীর বুকে থেকেই আকাশমার্গে বিচরণ করতেন। বেদজ্ঞরা যখন আকাশপথে বিরাজ করতে লাগলেন, তাঁরা দু'হাত তুলে 'রাম নারায়ণ রাম', 'রাম নারায়ণ রাম' এই বলে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। বেদজ্ঞরা, ঋষিরা যখন আকাশগতিতে আকাশপথে বিচরণ করতেন, তাঁরা লিখতে শুরু করলেন। আপনগতিতে তাঁদের নিজ হস্তে কি যে লিখছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন না। কি যে লেখা বের হচ্ছে দেখতে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের হাত থেকে 'রাম নারায়ণ রাম' লেখা বের হচ্ছে। ঋষিরা বেদজ্ঞরা ভাবতে লাগলেন, কেন বারবার 'রাম নারায়ণ রাম' বের হচ্ছে? কেমন করে বের হচ্ছে? তাঁরা ভাবতে লাগলেন, কি করে বের করবেন 'রাম নারায়ণ রাম' তত্ত্ব। খুঁজতে খুঁজতে যখন তন্ময় হয়ে গেলেন, তখন তাঁরা গভীর সত্তায় সাড়া পেয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা বলো, 'রাম নারায়ণ রাম।' **চুম্বকের টানে লোহা যেমন চলে যায় তার (চুম্বকের) কাছে, তেমনি করে মহামন্ত্রের সুরের টানে জীবের দেহ-মন চলে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে। তাই তোমাদের কাজ হচ্ছে শুধু বীজমন্ত্র জপ করা, মহানাম করা।**

শিশুবয়স থেকে আমি যে অনন্ত সুরের ধারায় মগ্ন হয়ে আছি, সেই সুরে বিশ্বের সবারই সমান অধিকার। সকল জীবের জন্যই এই সুর সমধারায় চির প্রবহমান। এই সুরে কোন জাতিগত বা নীতিগত বিবাদ বিচ্ছেদ নেই। মহাকাশের এই সুরের সাধনায় কোন দেবদেবতার বালাই নেই; মারামারি, দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতা নেই। সুরের ধর্ম জীবধর্ম, জীবজগতের ধর্ম। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এই সুর। সৃষ্টির সেই সুরের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার, তা প্রতি জীবেই ন্যস্ত। সৃষ্টির ধারায় ধারায় সেই সুরের ধারাবাহিকতার ধারা যখন তোমার সুরে সুর দেবে, আপনিই তখন তুমি সুরে প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি সুরে ভরপুর হয়ে যাবে। এরজন্যই যে সৃষ্টি সবার।

মহাশূন্যে কি আছে, কি নেই, পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এই জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে, প্রতি বস্তুর বস্তুত্বকে বিশ্লেষণ করলে, প্রতিটি জীবের মাঝে সুরের ধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করলে, সুরের সচেতনতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই দেহযন্ত্রের কথাই ধর। দেহযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলে গভীরভাবে চিন্তা করলে কোন কুলকিনারাই পাবে না। ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে যাবে। তেমনি সৃষ্টির সুরে প্রতিটি বস্তুকে যদি ভাবা যায়, প্রতি বস্তুর বস্তুত্বকে বিশ্লেষণ করতে করতে যদি ডুবুরী হয়ে থাকা যায়, দেখবে কি অমূল্য সম্পদ রয়েছে তাতে। যতই জানবে, ততই তন্ময় হয়ে যাবে। তাই বিশ্বপ্রকৃতির আদর্শের সেই 'আদর্শলিপি' পাঠ কর। প্রকৃতির বর্ণবোধের বর্ণমালায় পরিচিত হও। তবেই সবাই জানতে পারবে, কেন এসেছ? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? কোন্ প্রয়োজনে বৈচিত্র্যময় এই সৃষ্টি? কি তার উদ্দেশ্য? সবই তখন জানতে পারবে। তখন জানবে **কেনই বা জন্ম, আর কেনই বা মৃত্যু? এর আগে কোথায় ছিলে, কিভাবে ছিলে, আদৌ ছিলে কি না, প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় মহানামের সুরে সুরে মন্ত্রের ধ্বনিতে ধ্বনিতে সকল রহস্যের দরজা আপনিই খুলে যাবে।** এই সুর সাধনায় কোন গল্প কল্পনা বা অবান্তর কথার প্রয়োজন নেই। এই মৃণ্ময় পৃথিবীতেই রয়েছে সবকিছুর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

একবার বেদজ্ঞরা সমস্ত দেবতাদের, ঋষিদের ডাকালেন। শুধু এই পৃথিবীর নয়, কোটি কোটি পৃথিবীর সব মহানদের ডাকালেন একটা পৃথিবীতে। সর্বজগৎ হতে সব ঋষি একত্রিত হলেন। তাঁরা সবাই মহান, দেবতা। সেই পৃথিবীতে এসে হাজির হলেন। কিভাবে জীবের মুক্তি হয়। কোন্ সুর, কোন্ শব্দ, কোন্ কথা বললে জীবের সবকিছুর সমাধান হয়, তাঁরা বের করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা চক্ষু বুঁজে বসে বিশ্বের ধ্বনিকে অবলম্বন করে একটি শব্দ নিয়ে আসলেন, 'রাম নারায়ণ রাম'। সমস্ত দেবতারা, সমস্ত ঋষিরা একই সুরে বললেন, 'রাম নারায়ণ রাম'। তাঁরা বের হয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, 'রাম নারায়ণ রাম।' আকাশ পথে একবার বলো 'রাম নারায়ণ রাম।' এই পৃথিবীতে একটি মাত্র আছে কথা, 'রাম নারায়ণ রাম'।

সমস্ত জগৎ হতে সব ঋষিরা একটি গ্রন্থ পাঠালেন। সেই গ্রন্থের পাতা আলোর মত, সূর্যের মত তার তেজ। এই গ্রন্থটিকে দিলেন শিব এবং বিষ্ণুর হস্তে। সেই গ্রন্থটি হচ্ছে ১০৮ পাতার। এই ১০৮ পাতা মুখস্থ করার জন্য তাঁদের উপর নির্দেশ হলো। বিষ্ণু এবং শিব একত্র বসে পাঠ করছেন। প্রথম

পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন 'রাম নারায়ণ রাম।' দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন 'রাম নারায়ণ রাম।' তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন 'রাম নারায়ণ রাম।' শিব এবং বিষ্ণু তখন এর অন্তর্নিহিত অর্থে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁরা দুজনে মিলে একত্রিত হয়ে দেখলেন, গ্রন্থের নবম পৃষ্ঠায় 'রাম নারায়ণ রাম।' তখন তাঁরা সমগ্র জীবজগৎকে এই কথা বলে স্বাক্ষর দিলেন যে, তোমরা সকলে মিলে সেভাবে বলবে, 'রাম নারায়ণ রাম।' এইভাবেই তাঁরা জীবলোকের পথ পরিষ্কার করে গেলেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক হাঁটতে চলতে আকাশে বাতাসে শুধু একই কথা বলবে, রাম নারায়ণ রাম। তাঁরা নিজেরাও এই সুর হয়ে গিয়ে জীবকে বলে গেলেন, তোমরা সবাই এই নাম করবে। তাই একদিকে যে বীজমন্ত্র আছে, তা মনে মনে জপ করবে। আর এই মহানাম করবে, 'রাম নারায়ণ রাম।'

আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। প্রতিমুহূর্ত্তেই আসছি; আবার প্রতি মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি। যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু হতে ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণে অভিহিত হয়ে সবাই আমরা পরিবর্ত্তনের মাঝে পরিবর্ত্তিত হতে হতেই চলেছি। এই চলার পথের পাথেয় হচ্ছে নাম ও জপ। তারই মাধ্যমে জাগাতে হবে সেই নিনাদের ধ্বনিকে যা আজ আমাদের মাঝে সুপ্ত হয়ে রয়েছে বীজাকারে। এরজন্য আলাদা কোন সাধনারও দরকার হয় না। **জেনে বা না জেনে প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে এক জাতীয় সাধনা করেই যাচ্ছে। প্রতি জীবেতেই রয়েছে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি যার কিছুটা পরিচয় সবাই পাচ্ছি, যার যার বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে।** মুক্তভাবে চিন্তা করলে সেই শক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই জেগে উঠবে। শাস্ত্রে আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সাধনপথের বিঘ্ন বলা হয়েছে। সেটা ঠিক নয়। এগুলো সেই বিরাটের বিরাট সুরেরই সাড়া, মহানন্দের পরম তৃপ্তিরই নমুনা। কাম, ক্রোধ, লোভ আমাদের অন্তর্নিহিত সুরেরই সাড়া।

আমাদের যেই মন আজ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে, তাকেই কাজে লাগাতে হবে। এখানে তাই নৈরাশ্যের কোন কথাই নেই; ভাগ্য বা কর্মফলের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে রয়েছে দর্শনের সাধনা, শ্রবণের সাধনা, মুক্তির সাধনা। যেই মন ও বুদ্ধি নিয়ে আমাদের জন্ম, তাকেই কাজে লাগাতে হবে। সহজাত শক্তিকেই নিজ নিজ প্রচেষ্টায় জাগাতে হবে, বাড়াতে

হবে। মন যখন মূলের সন্ধানে এগিয়ে যাবে, আপনমনে আপন সুরে আপনধারায় চলতে থাকবে, প্রয়োজনের তাগিদেই তখন সকল সন্ধান এসে উপস্থিত হবে। সাথে সাথে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে সাজানো রয়েছে হারমোনিয়ামের ন্যায়। তারই পর্দা টিপে টিপে যখন যা প্রয়োজন, সেই সুর বের করতে হবে। স্রষ্টার বিরাট শক্তি যেভাবে চলছে, সেইভাবেই চলার পথের পথিক আমরা। তাই ভাবনার কিছু নাই। **আমাদের সবার ভিতর দিয়ে বিরাটের সেই বিরাট শক্তিরই রেশ খেলছে। যে উপলব্ধির মাঝে রয়েছি আমরা, সেটা সেই বিরাটেরই বিরাট সুরের সাড়া। সবাই আমরা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই রয়েছি। স্রষ্টা সর্বাবস্থায় আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, "মিশে যাও তোমরা আমার আমিত্বের সাথে। প্রতি জায়গায় যখন আমাকেই খুঁজে পাবে, তখন তুমি নিজেই হয়ে যাবে, 'আমিময়।'** সকল বস্তুই তখন তোমার সুরে সাড়া দেবে"। তখন দেখবে, তুমি কোথায় চলে গেছ। সবার হাত তখন তোমার হাত, সবার মন তখন তোমার মন হয়ে যাবে। সমস্ত বিশ্বই তখন তোমার হয়ে যাবে। গোটা জগৎটাই তোমার রূপ হয়ে যাবে। সেদিন উপলব্ধি করবে কি বিরাট ক্ষমতা তোমার; সেদিন দেখবে অনন্তরূপের মাঝে রয়েছে তোমারই রূপ। সত্যিকারের সমভাব তখনই আসবে। তখনই জানবে প্রকৃতির প্রকৃতস্থ রূপকে। তাই সর্বদা ভাববে, "শুদ্ধ ও মুক্ত আমরা। **আমাদের মাঝে কোন ক্লেদ পঙ্কিলতা নেই।" ক্লেদ যাকে বলা হয় এখানে, সেটা অন্তরায় নয়। সেটা হচ্ছে মূলবীজকে জাগাবার সার। মূল বীজেরই সাড়া।** একটু চেষ্টা করলেই এই বোধ সত্যিকারের বোধে আসবে।

তোমাদের কাছে আমি বারেবারে বলছি, যেই সুর তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি, সেই সুরকে পাথেয় করে পথ চলবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম। তোমরা এবার করবে মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম।' এই 'রাম নারায়ণ রাম' আশ্রমের বৈরাগী আর বোষ্টমের নাম নয়। এই গান হচ্ছে সেই গান, যে গান করলে ভিতরের (দেহের ভিতরের কোটি কোটি অনুপরমানুর) সুর জেগে ওঠে। এই মহানামে দেহের ভিতরের মহাযন্ত্রের শক্তি ফুটে উঠবে। এই রাম নারায়ণ রামের বিরাট অর্থ আছে। সেই বিরাট অর্থবোধে এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম।

সেই মহানামের নাম অনুযায়ী এখানকার দেবদেবতা রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণের নামকরণ করা হয়েছে। মহাকাশই মহাকৃষ্ণ। সেই আকাশের কৃষ্ণের নাম অনুযায়ী বৃন্দাবনের কৃষ্ণের 'কৃষ্ণ'*১ (*১ ধ্যানেতে বসিয়া গর্গ দিল কৃষ্ণ নাম।) নাম রাখা হয়েছে। 'রাম' শব্দের একটা অর্থ আছে। 'নারায়ণ' শব্দেরও একটা অর্থ আছে। 'রাম' অর্থ বিরাট। 'রাম' নামে অনন্তবিশ্বের সুর এবং ধ্বনিকে বুঝানো হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের কোটি কোটি কোটি কোটি বছর আগে মহাকাশের এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। মহাকাশের অর্থ অনুযায়ী নাম অনুযায়ী অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলের নাম রাম।

শব্দ এবং ধ্বনির সংকীর্তনের মহা সুরধ্বনি হচ্ছে রাম নারায়ণ রাম। তাই এই গান হচ্ছে মহান অগ্নিস্বরূপ; মহান অস্ত্রস্বরূপ। এই গানের অর্থবোধে সমাজকে গড়ে তুললে সেটা হবে সর্বাঙ্গসুন্দর। তাই ত্রিশূল হাতে স্বয়ং শিব অনাহতে (বক্ষে) লিখলেন এই মহানাম রাম নারায়ণরাম। বেদমন্ত্র....। **আজ্ঞাচক্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সূর্যের আলোকে আলোকিত, অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। শিবের সর্প আছে বিষহরি। অনাহতে বিষ হরণ করে বিশুদ্ধে শোধন করে শিব আজ্ঞাচক্রে চলে গেলেন। বেদমন্ত্র....। সহস্রারে সহস্র সূর্য। সহস্রার সহস্র সহস্র সূর্যের আলোকে আলোকিত। সেই জ্যোতির্লোকে শিব গিয়ে বসলেন। সূর্যের আলোক, সেই যে গলিত লাভা, সেই যে অগ্নি, সেই যে উথালপাথাল, সেই সুরে মহাসুরের ধ্বনি রাম নারায়ণ রাম।** বেদমন্ত্র....।

সঙ্গীতের যে স্বরগ্রাম সা রে গা মা পা ধা নি— এই 'সা'তে যে সুর গান গাওয়া যায়, তারই ২৫ হাজার সিঁড়ি (ধাপ বা স্তর) উপরে উঠলে দেখা (পাওয়া) যায়, মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। মূলাধার (গুহ্য দ্বার) স্বাধিষ্ঠান (মূত্রদ্বার), মণিপুর (নাভিমূল), অনাহত (বক্ষ), বিশুদ্ধ (কণ্ঠ), আজ্ঞাচক্র (দুই ভ্রূ-র মাঝখানে দ্বিদল) ও সহস্রারে (মস্তিষ্কে) এই দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুরে সুরে এই স্বরগ্রাম জানা যায়। এই ২৫ হাজার সিঁড়ির উপরে (ধাপে বা স্তরে) যেই কথা, যেই ধারা, যেই দেহবীণার কথা আছে, যেই স্বরগ্রামের কথা আছে, তাই হল রাম নারায়ণ রাম। যদি সা রে গা মা পা ধা নি— এই কথাগুলো, স্বরগ্রামের ধ্বনিগুলো সত্যি হয়ে থাকে, তাঁদেরই (২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মহানদের) ভক্তের

ভক্তদের অনুগতদের সেরা কথা, সেরা মন্ত্র, সার কথা হল রাম নারায়ণ রাম। মূলাধার থেকে সহস্রারে দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রে আছে এই কথা গাঁথা; আছে মহাকাশের এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। সেই গান, সেই গীতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের মন্ত্রে।

তাই বেদজ্ঞরা দ্বারে দ্বারে সর্বত্র সর্বজায়গায় বললেন, মহাকাশের মহানাম বিরাট অর্থবোধে বিজ্ঞানসম্মত সেই নাম রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। হে পথিকগণ বল সবে রাম নারায়ণ রাম। এই রাম নারায়ণ রাম রইল তোমাদের পথের পাথেয়। এই মহা অস্ত্র (রাম নারায়ণ রাম) তোমাদের হৃদয়ে রইল গাঁথা। এই মহানামের অস্ত্রের কথা শিব নিজে বলেছেন, বিষ্ণু নিজে বলেছেন। গায়ত্রী নিজ হস্তে অর্পণ করেছেন। কাকে দিয়েছেন এই মহানাম? এই মহানাম তোমরা পেয়েছ। এই নাম তোমরা গেয়ে যাবে পথে ঘাটে। আপনি তোমাদের এই মহানামের মহা সুরের স্ফূরণ হবে। আপনি এই মহামন্ত্রের মহাধ্বনি মহাকাশে ছেড়ে দেবে। মহাকাশে গাইবে মহা সুরের গান রাম নারায়ণ রাম।

তাই বলছি, এই বিরাট মহানামের অস্ত্র তোমাদের হাতে। **এই আজ্ঞাচক্রের জ্ঞানচক্ষুতে আছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সমন্বিত এই ত্রিশূল, শিবের ত্রিশূল। এটা লোহার ত্রিশূল নয়। আজ্ঞাচক্রের ত্রিশূল নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাবে। তোমরা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় এইভাবে এগিয়ে যাবে। অসুর আপনিই দমন হয়ে যাবে। অস্ত্র ধরতে হবে না।** মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ। তেমরা সেই পথের পথিক। এটা দুর্বলতার কথা নয়। স্বয়ং গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, মনে রেখো। তাই তোমরা কোনরকম ভয়ভীতিতে না গিয়ে এই মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম'-এর মহা অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাবে। হে পথিক, হে যাত্রিক, জয় তোমাদের অনিবার্য।

প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে, তত্ত্বের খনি হতে মণি আহরণ করে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমি জন্ম থেকেই বিশ্বের সুর নিয়ে এসেছি। যে জ্যোতি, যে আলো, যে চিন্তাধারা হতে আমি এসেছি, সব ভক্তশিষ্যদের যাতে সেখানে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। সামান্য জিনিস দিতে আমি আসিনি। বিশ্বের সেই আদিশক্তি, যখন কিছুই ছিল না,

সেই আদিতম বীজ শক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই তোমাদের ঠাকুর এখানে এসেছেন। সেই বীজই তোমাদের দান করা হয়েছে। এই মন্ত্রই একদিন তোমাদের ভিতর জেগে উঠবে। আর এনেছি, মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই মহানাম এনেছি তোমাদের জন্য।

অহর্নিশ আপনমনে বীজমন্ত্র জপ করে যাও। মহানাম করে যাও। মূলমন্ত্রকে স্মরণ করে নিজের নিজের মাঝে তন্ময় হয়ে যাও। **হে পথিক, অনন্ত পথের যাত্রিক, ভুল করো না, ভুল বুঝ না। সময় যে আর নেই। সূর্য অস্তগামী। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। নিজের নিজের পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। সর্বদা খেয়াল রাখবে, "পৃথিবী হচ্ছে অতিথিশালা। আর এই সংসার তৈরী হবার জন্য।" অহর্নিশ মূলমন্ত্র স্মরণ করতে করতে চৈতন্যের দ্বার যেদিন খুলে যাবে, সেদিন সেই মহাচৈতন্যকে উপলব্ধি করে তোমার সকল চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে।**

আর গাইবে সদা সর্বদা মহাকাশের সেই মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। শিব, বিষ্ণু সদা সর্বদা জপ করতেন এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। গায়ত্রী দেবর্ষি নারদকে দিলেন এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। পার্বতী যখন শিবকে বন্দনা করতেন, তখন বলতেন রাম নারায়ণ রাম। পার্বতী সদাসর্বদা হাঁটতে চলতে শ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু বলতেন, রাম নারায়ণ রাম। শিবশম্ভু ত্রিশূল হাতে যখন এদিক ওদিক যেতেন, তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে বের হতো রাম নারায়ণ রাম। বিষ্ণু যখন চতুর্বাহু বের করে যেতেন, তাঁর সর্ব অঙ্গে চোখে মুখে ফুটে উঠতো, বেজে উঠতো রাম নারায়ণ রাম। নারদ বীণাযন্ত্রে দ্বারে দ্বারে বাজালেন এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। তাই তোমরা সবাই যার যার দেহবীণাযন্ত্রে মুক্তভাবে মুক্ত মনে বাজাও এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার মন্ত্রে কেউ পড়ে থাকবে না, যেতে বাধ্য

সুখচর ধাম

১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৯

এই অনন্ত বিশ্বের সুর এইভাবেই বাজতে থাকে অবিরাম। সেখানে কোনরকম চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বা চাঞ্চল্যের জন্য আসে যায় না। তোমরা ঘরকে রক্ষা কর, সমাজকে রক্ষা কর। ঘরের মা বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখ। তাদের শ্রদ্ধা কর, তাদের আত্মতৃপ্তির জন্য ব্যবস্থা কর এবং সমাজ যাতে রক্ষা হয়, তার ব্যবস্থা কর। বেদমন্ত্র ..... হে রাম নাম। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম। এই রাম নারায়ণ রাম মহানাম তোমরা করবে এবং 'কর্মের পথে' এই গান গাইবে। এই সুরটা (শ্রীশ্রী ঠাকুরের দেওয়া রাম নারায়ণ রামের সুর) ভাল লাগে না? হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। এই সুরটা আমি দিয়েছি। এই সুর মহাকাশের সুর, মহাকাশের ধ্বনি। এই গানের সুর বাজাবে অবিরাম। তোমাদের জন্য আর কিছু নয়। আর অন্য গানের প্রয়োজন নাই। অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। সব গানের সার অর্থ হল রাম নারায়ণ রাম।

রাম নারায়ণ রাম। রা হচ্ছে মুক্তাকাশের মুক্ত বাণী। ম হচ্ছে মহাকাশের আদিবাণী। আর নারায়ণ হচ্ছে অনন্তবিশ্বের সুরের সাথে যে সুর গেঁথে আছে এবং তোমার ধ্বনির সাথে এক সুর দিয়ে যা গাঁথা। এই নারায়ণ শব্দই হচ্ছে মহাকাশের অনন্ত সুর, যাকে আনয়ন করেছ, আহ্বান করেছ। এই মুক্তাকাশের মুক্তবাণী এবং তার অনুপরমাণু নিয়েই হচ্ছ তুমি এবং আকাশের সব কিছু। তাই আকাশের স্বচ্ছতায়, আকাশভরা সুর নিয়ে, ফাঁকা আকাশে সীমাহীনের সুর নিয়ে তোমরা এসেছ। তাই **তোমরাও অসীমের সন্তান, সীমাবিহীনের সন্তান। তোমাদের ভিতরে জেগে আছে এই মহাকাশের বীজ। তাই এই দেহেতে, এই দেহবীণাযন্ত্রে সেই মহানাম বাজাও। তোমাদের গান, তোমাদের সুর, তোমাদের ধ্যান, তোমাদের ধারণা এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। তোমরা বাজাবে এই মহানামের সুর। সুরের মাধ্যমে যখন বাজতে থাকবে অবিরাম, এক পরমানন্দের ঢেউ এসে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।** এই মহাকাশের মহানাম অনন্ত সীমাহীন। এই

সীমাহীন মহাচেতনায় ভরা; মহা অনন্তের মহাশূন্যের অনুপরমানুতে ভরা। এই মহাকাশ যার আদি নাই, অন্ত নাই, তারই নাম রাম নারায়ণ রাম। তোমরা গাইবে সেই নাম। এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই দেহে আছে সেই সুর, সেই বীজ। তাই পথিক তোমরা, যাত্রিক তোমরা এই পৃথিবীর বুকে বাস করছো। এই দেহযন্ত্রটা নিয়ে বাজাবে সেই সুর, সেই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। এই নামে যতবেশী সুর দেবে, যতবেশী নাম করবে, ততই ভিতরে ফুটতে থাকবে। এই সুর, এই ধ্বনি এমন অর্থবোধে গাঁথা যে, যার ভিতরে যত বেশী এই সুর ধ্বনিত হবে, আপনা আপনি এই সুর মহাকাশের বর্ষণের মত, গর্জনের মত জেগে উঠবে। খালি আকাশে জল দেখ না? খালি আকাশে মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমকানি দেখতে পাচ্ছ না? এতবড় সূর্য, এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, কে এত আগুন জ্বালাল? মহাশূন্যের বুকে কে এত জল জমাচ্ছে? সূর্য তোমাদের ভাই। ভাই মানে একই রক্ত তোমাদের। নিদাঘের রাগে সাগরের জলরাশি বাষ্প হয়ে সঞ্চিত হচ্ছে মহাকাশে, মহাশূন্যে। কত অর্থবোধে এই সুর। তাই **তোমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে একসুরে সমসুরে এই গান গাইবে। প্রতি স্তরে স্তরে প্রতি পদে পদে মহাকাশে মহা সুরের মন্ত্র মহা চেতনার মন্ত্র এই রাম নারায়ণ রাম। তোমাদের পাথেয়, তোমাদের মহাসাথের সাথীর মন্ত্র এই রাম নারায়ণ রাম।** এই সুর নিয়ে তোমরা ঘরে ঘরে যাবে। রাধা যে গান গেয়েছিলেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ.... রাধা তারপরে গাইলেন রাম নারায়ণ রাম। ত্রিশূলে চলে গেল এই নাম রাম নারায়ণ রাম।

বেটা, গুরু কোথায়? এই সমাজের বুকে গুরু কোথায়? এরা পার করতে পারে না। এদের নেবার ক্ষমতা নাই। এরা ভেজাল বাধাতে ওস্তাদ। এরা পরগাছা হয়ে সমাজে রয়েছে। আর তোমাদের ঠাকুর শিশুবয়স থেকে লাঠিঠেঙ্গা নিয়ে রয়েছে। আমি সমস্ত পরগাছা কাটতে এসেছি। গুরু সাজতে আমি আসি নাই। ভগবান সাজতে আসি নাই। আমি মহাকাশের বীজ। সমস্ত আগাছা আর পরগাছাদের ছাঁটাই করতে এসেছি। আমি কুলি কামার। আমি খনির কর্মী। আমি হরিজন। দেশের মাটির সাথে মাটি হয়ে সমস্ত পরগাছা উপড়ে ফেলে দেব। তাই তোমরা আর কিছু নয়। আমার এই কর্মের সাথে যোগ দিয়ে তোমরাও হও বেদের কর্মী। বেদের পূজারী আমি। বেদের সুরে সুর মিলিয়েছি। আমার সাথের সাথী করে তোমাদের সন্তান তৈরী করেছি।

তোমরা লাঠিঠেঙ্গা নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমাজের বুকে নেমে যাবে। যেখানে পরগাছা, সেখানে ছাঁটাই করে দিয়ে সহজ রাস্তা তৈরী করে নেবে। সহস্র রাস্তা তৈরী করবে সবার জন্য। আর **তোমাদের মুক্তির মন্ত্র, তোমাদের দেবতা, তোমাদের ভগবান মাটিতে গাঁথা, আকাশে বাতাসে গাঁথা। তোমরা নিজেরাই তার সত্তা। তোমাদের ভগবান অন্যত্র খুঁজতে যাবে না। তোমাদের ভগবান এই বিবেক, এই চেতনা। আর রয়েছে আমার দেওয়া নাম রাম নারায়ণ রাম।**

তোমরা খোঁজ নিজের ভিতরে খোঁজ (আত্মানং বিদ্ধি)। বিবেকের মন্দিরে এই অনাহতে খোঁজ। এই অনাহতে খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে বিশুদ্ধে নাও, আজ্ঞাচক্রে নাও, সহস্রারে নাও। আপনমনে গেয়ে যাও। **এই গান তোমরা গাইবে সর্বত্র। সেখানে হতাশা, নিরাশা নাই। কে ডাকলো, কে ডাকলো না, মান অপমান মাটিতে মিশিয়ে দাও। তোমরা মাটির মানুষ। মানুষের লাথি খেয়ে যাও। বুট মারিয়ে চলে যাক তোমাদের এই অনাহতের উপর দিয়ে।** কিন্তু জান না, এই মাটিই একদিন হিমালয় হয়েছিল। সেই হিমালয়ের দৃঢ়তা, কাঠিন্য অশেষ। হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে জানাবে তোমাদের এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। আমরা মাটির মানুষ, আমরা মাটির মানুষ। তোমরা নির্ভাবনায় সবাইকে কোল দাও, সবাইকে আশ্রয় দাও, সবাইকে সেই যোগসূত্রে গাঁথ। সবাইকে এক সূত্রে বাঁধ। সেখানে কোনরকম কোন কিছু করবে না। যে যা খুশী বলে যাক। তোমরা গঙ্গানদীর তীরে বাস করছো। এই গঙ্গানদী তোমাদের কাছে পবিত্র হয়ে রয়েছে আজও। যত রাজ্যের আবর্জনা সে বহন করে নিয়ে চলেছে। হিন্দুদের কাছে আজও সে অপবিত্র হয়নি। সেই মহানামের স্রোতে তোমরা ভাসছো। সব আবর্জনা ক্লেদ পঙ্কিলতা নিয়ে তোমরা চলবে। সেই অসারই সারে পরিণত হয়ে যাবে। তাই সমাজের অসুরকে দমন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। **সমাজে যারা ধর্মের নামে শোষণ করছে, সেই পরগাছাগুলিকে ছাঁটাই করে দেবে। আস্তে আস্তে আমরা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবো। সেখানে খালি হাতে নয়। এক হাতে থাকবে মৃদঙ্গ, করতাল। আরেক হাতে থাকবে আমাদের দেবদেবীদের মূর্তিদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র।** আমরা খুন চাই না। আমরা অপারেশন করবো। যেখানে ক্লেদ আছে, বার করে নেব। সেইভাবে সেই প্রস্তুতি নিয়ে তোমরা

চলবে।

ন্যায়নিষ্ঠার পথে, বিবেকের সুরে পথ চলাই আমাদের ধর্ম। আমরা ধর্মের ব্যবসা করছি না। তাহলে আমি আজ কোটি কোটি টাকা করতে পারতাম। আমি ধর্মকে বিক্রী করে টাকা নিই না। বদনাম নিয়েছি অনেক। আজ এই পাঁচ কোটি সন্তান। কেউ বলতে পারবে না, আমি কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও চেয়েছি। পূজা-পার্বনের নাম করে কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও নিয়েছি। আমি তাদের মঙ্গল চাই। আমি তাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি, স্নেহ করি। পূজার নামে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে, যাগযজ্ঞের নামে এই ঠাকুর পয়সা নেয় না। আমি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, বাচ্চা মানুষ করেছি। ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। আর বদনাম দিচ্ছে কারা? যারা হিংস্র, যারা হিংসুক, তারা। তাদের বোঝা উচিত। আমার যখন ১৪/১৫ বছর বয়স, তখন যাদের দেড় বছর, দুই বছর; আমার যখন ৪০ বছর বয়স, তাদের বয়সও তো বাড়লো। সেই ১৮০০ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছি কত পরিশ্রম করে। তাদের কাপড়-চোপড় দেওয়া থেকে শুরু করে লেখাপড়া শেখানো, বিয়েশাদি দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্ত্তব্য করেছি। কিন্তু যখন তারা বড় হয়ে যায়, শাড়ী পরে, দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে, তখন বদনাম দেয় তোমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। তারা জানে না, এরা বাচ্চা বয়স থেকেই আমার কাছে ছিল। তাদের খাওয়া পরা, বিয়ের ব্যবস্থা, সবরকম ব্যবস্থা করার সময় তো কেউ আসে না। কিন্তু দুর্নাম দেবার সময় তারা ঠিক আসে। আমি দুর্নামের ভিতর দিয়ে রাস্তা করেছি। অপবাদকে আশ্রয় করেই আমি রাস্তা তৈরী করেছি। পেপারে পেপারে আমার কত বদনাম দিয়েছে। আমি যুদ্ধ করেছি, আমি সংগ্রাম করেছি। আমি লড়াই করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জিতেছি। কারও পরোয়া করিনি। আমি কাউকে গ্রাহ্য করি নাই। কোন সরকারকে না। হিম্মৎ যদি থাকে বেটা, লড়াই কর। কারও সঙ্গে compromise করি নাই। মরতে যদি হয়, তুই মরবি, না হয় আমি মরবো। আমাকে সহ্য করতে পারেনি। তবু আমি মনস্থির করে নেমেছি, শয়তান বিনাশ করবোই, যে যতই যা কিছু আমাকে বলুক। তোমরা আমার সন্তান হয়েছো। তোমরা লাঠি নিয়ে, অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। যেখানে শয়তান দেখবে, বিনাশ করবে। একেবারে পরিষ্কার করে দেবে। তারপরে হবে কৈফিয়ৎ। সেইভাবে প্রস্তুতি

নিয়ে প্রস্তুত হয়ে তোমরা কাজ করবে। আবার আরেকদিকে রাম নারায়ণ রাম মহানাম গাইবে। সেই মহানামের মহাসুরে ডুবে থাকবে। আজও ভারতবর্ষে এত লোক কারও নেই, ভুলে যেও না। আমাদের যে সংগঠনে আজ প্রায় পাঁচ কোটি লোক, এই পাঁচকোটি সন্তান ভারতবর্ষে কোন সংগঠনে নেই। তোমরা বিরাট আকারে কাজ করবে। এক ডাক দিলে সমস্ত জায়গা ভরে যাবে। তোমাদের সাথে যুদ্ধে কেউ পারবে না। তোমরা একটা করে ইটের চাকা নিলে ইটের চাকার পাহাড় হয়ে যাবে। তবু আমরা চুপ করে আছি সবার কাছে। কেন জান? আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। আমরা এমনি ক্ষিপ্ত হই না। সাধারণ ঝগড়ায় আমরা কর্ণপাত করি না। আমরা ব্যক্তিগত ঝগড়া চাই না। আমরা চাই দেশের শত্রু যারা তাদের পরিষ্কার করতে। তোমাদের রাম নারায়ণ রামের এইটাই হইল মহান অর্থ যে, এই মহা সুর মহা কীর্তন। বিরাট অর্থবোধে এই রাম নারায়ণ রাম। তাই বেপরোয়া হয়ে তোমরা চলবে। কিন্তু মানুষের কাছে বিনয়ী হয়ে থেকো। তোমরা যত বড়ই হয়ে থাক, এভাবেই চলবে।

তোমরা কর্মী। কর্মের পথই তোমাদের পথ। কর্মই হল তোমাদের ধর্ম। এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত ধর্ম তোমাদের জন্য নয়। এই ধর্মে তোমাদের কোন দরকার নাই। তোমরা কর্মের পথিক। সুতরাং কর্মের পথেই চল।

আমি বলেছি, দ্যাখ বেটা, আমি ৫ বছর বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। আমার স্কুলের মাষ্টার, হেডমাষ্টার মশাইরা দীক্ষা নিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন দীক্ষা নিয়েছে। তখন আমার ৫/৭ বছর বয়স। সেইসব মাষ্টাররা এখনও আসেন। **আমি ইঞ্জিন হয়ে আছি। বগ্‌গীর মতন পার করে দেব। পার করতে পারছি বলেই আমার হিম্মত হয়েছে। নিজের কথাই আমি তোমাদের বলছি। নিজের কথা বলছি। আমার মন্ত্রে কেউ পড়ে থাকবে না। যেতে বাধ্য। যাওয়ার জন্যই আমার সুর।** আমার রক্তে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের রক্ত রয়েছে এখনও। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত আমি, ভুলে যেও না। যে যত কিছুই বলুক, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের শেষ রক্ত আমি। এই শেষরক্ত শেষ কাজ করে দিয়ে যাবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যখনই তোমরা জপ করছো বাড়ীতে বসে, গুরু তখনই টের পান

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৬

মন্ত্র এমনি শক্তি, এমনি সমন্বয় শক্তি, এমনি বিরাট শব্দ, যে শব্দ মূলে মিশতে মিশতে এক সুরে ভেসে ভেসে এসেছে বিশ্ব মহাকাশ হতে জীবকল্যাণে। জীব সৃষ্টি হয় সেই মন্ত্র হতে, সেই ধ্বনি হতে। সেই সুরে আছে অফুরন্ত ধারা। এই মহাকাশ আপনি ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেই মূল ধ্বনি মূলাধার হতে সহস্রারে বেজে উঠেছে, যাহা জেগেছিল একদিন। সেই **চৈতন্য মহাকাশে মহাশক্তিরূপে সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমস্ত অনুপরমাণুর মিলিত ধ্বনির মাঝে জাগ্রত হল। সেই সুর, সেই ধ্বনি, সেই মন্ত্রের রূপ প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তাহাই আমাদের একমাত্র সাধনার বস্তু, উপাস্য বস্তু।** সেই জ্ঞান, সেই নাম যদি আমরা দিনরাত অহর্নিশ জপ করে যাই মূলাধার হতে সহস্রারে, তবে 'আছি' এবং 'নাই'-এর মাঝে আপনভাবে আপনসুরে সেইভাবেই আমরা বিরাজ করবো, যেভাবে আমরা বিরাজিত ছিলাম; যেইভাবে এসেছি, আজ যা স্মরণে নেই। সেই বস্তুকে স্মরণ করে আমরা অগ্রসর হয়ে যাব। সেই সুর যেখানে মিলিত হয়ে রয়েছে, যেভাবে রয়েছে, সেভাবেই আমরা মিলবো। সেই চৈতন্য সেই শব্দধ্বনি যা একদিন ছিল, যা আনতে আজ অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণভাবে। মিলে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের মাঝে এমনভাবে বিদ্যমান যে, আমরা পূর্ণসত্তায় সবকিছুতে এমনিভাবেই মিশে আমাদের কর্মের ভিতর দিয়ে সেই সত্তাকে খুঁজে পাব।

মন্ত্রের রূপ এই জগৎ। ধ্বনির রূপ এই জগৎ। শব্দের রূপ এই জগৎ। আমরা যদি সেই মন্ত্রকে, সেই ধ্বনিকে স্মরণ করি, তবে আমরাও সেই মন্ত্রের ন্যায় এক হয়ে যাব। নানা রকমের কর্মের ভিতর দিয়ে যে জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে, যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে করি, আজ তাও প্রয়োজন। সব কিছুই অগ্রসর করিয়ে নিচ্ছে আঘাতে প্রতিঘাতে। প্রতি বস্তু স্বাদে, ঘ্রাণে আমাদের অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। প্রতি বস্তুর সাথে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ত্বক এবং

ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ আমাদের অগ্রসর করিয়ে নিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা ছিল বা আছে বলেই সব বোধগম্য করছি। জীবনে প্রতি বস্তুকে যে আমরা বোধগম্য করছি, এসব আগে থেকেই বোধগম্য ছিল বলেই বোধগম্য করতে পারছি। সেই বোধ পরিস্ফুটিত হলে আরও বেশী বুঝতে পারবো। প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ করে দিচ্ছে। যে সজাগ ছিল, যে সচেতনে ছিলাম, সেই চেতন আজ জেগে উঠেছে, সেটা সজাগ করে দিচ্ছে।

মহাকাশ থেকে বিরাট বিরাট মহানরা নাম করছেন, জপ করছেন। প্রতি বস্তু যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় হতে হতে মিলে যায়, এই দেহ এমনি মিশে যায়, আবার রূপান্তরিত হয়। **এই দেহ জপ করতে করতে মিশে যায়, অস্তিত্ব থাকে না, আকাশে বাতাসে মিলে যায়। কারণ দেহের সত্তা, বিশ্বের সত্তা একই। দেহের যন্ত্র, মনের যন্ত্র রয়েছে অনন্ত মহাকাশের যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগে। শুধু এই মন্ত্রের সাহায্যে স্মরণের দ্বারাই আপনি স্ফূরণ হবে, এটাই নিয়ম।** আমাদের পথ অতি সুগম, অতি সুন্দর। আমরা যদিও নানান দিকে বিক্ষিপ্ত থাকি, এটা বিক্ষিপ্ততা নয়। এতবড় দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। যেখানে মৃত্যু আমাদের দৃষ্টান্ত; যেখানে রোগ, শোক, যেখানে আঘাত, সেখানে পথ অতি সুগম।

এই বাস্তবে কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। অপেক্ষা না করার কারণটা হলো বিরাটের সাথে তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। যোগাযোগ না হলেই আবার পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়ে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য, বুঝিয়ে দেবার জন্য, পরমানন্দের সাথে এক করে দেবার জন্য, তাঁর সাথের সাথী করে নেবার জন্যই তাঁর ব্যস্ততা। এই যে ভুলে থাকা, এই যে ভুল করে বসে আছি, এই ভুল, ভুল নয়। হে পথিক যখনই জানবে না, যখনই বুঝবে না, যখনই মনে হয়, ডাক বুঝি পৌঁছে না— পরম সত্তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে বলেই, তা মনে হয়। তিনি এমনই বিরাট, আমরা তাঁর ভিতরে থেকেও যে উপলব্ধি করতে পারছি না, এটাই হচ্ছে উপলব্ধি করা, এটাই তাঁকে পাওয়া। মাঝে মাঝে নানারকম দ্বন্দ্ব সন্দেহ যে ঘিরে ধরছে, এই ঘিরে ধরার মাঝে কোন্ সত্তা আছে? চলার পথের সাথী হয়ে সেই ক্ষমতা সমস্ত বিশ্বে রয়েছে। সেই ক্ষমতার পরিচয় নানাভাবে পাচ্ছ। সেই ক্ষমতা প্রতি বস্তুর ভিতর দিয়ে দেখছো, এতবড় গুণের পরিচয় পাচ্ছ। নানাসৃষ্টি নানারূপ, এই রূপই গুণ। তাঁর (স্রষ্টার) বিভূতি আমরাই। আমরা সেই বিভূতির বস্তু।

তাঁর (স্রষ্টার) বিভূতির ধারা দিয়ে প্রত্যেকের জন্ম। **প্রত্যেকেই এক একটা বিভূতি, প্রত্যেকেই এক একটা শক্তি। এই ধারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তোমরা যে বিরাট পুরুষ, শক্তিশালী পুরুষ অতি সহজে সেটা ধরতে পারছো না। এই ধরতে পারার ক্ষমতা তোমাদের আছে, তোমাদের ফুটবে।** কোন্ ধারাতে পাবে? **যেই নিয়মের ধারাতে জন্ম, যেই নিয়মের ধারাতে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিবেচনা, যেই নিয়মের ধারাতে দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি পাচ্ছ, সেই নিয়মের ধারাতে বিরাট সুর আপনিই এসে আমাদের মধ্যে বাড়ি খাচ্ছে।** একজন বিরাট মহান দূর থেকে সব দেখতে পাচ্ছেন। প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনি এসে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনই। যে ব্যক্তি যখন স্মরণ করে তার কথাটা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। স্মরণটা কথার মতো সমস্ত জগতে ভেসে যায়। **একজন মহানের স্মরণের সাথে সাথে কথার ন্যায় ভাসতে ভাসতে আসে। রেডিওর কথা যেমন ছড়িয়ে যায়, তেমনি একজন ভক্তের স্মরণের সাথে সাথে মহানের কাছে এসে হাজির হয়, 'প্রভু, আমি এই অবস্থায় আছি। রক্ষা কর।'**

তিনি (মহান) সাথে সাথে তার (বার্তা) পাঠিয়ে দিলেন। আবার কোনও ভক্তকে জানিয়ে দিলেন, 'তুমি এই করছিলে। আমাকে ডাকছিলে। ভোগ সাজাচ্ছিলে। আমি ভাল খেয়েছি। তোমার তালের পিঠে খাচ্ছিলাম,' এখানে বসেই জানিয়ে দিলেন।চিঠি লিখে দিলেন। কি করে খবর পেলেন? মাছি যেমন গন্ধে এক মাইল দূর হতে আসতে পারে, ৪০০ মাইল দূর থেকে মহান জানতে পারবেন না? বাতাসে সব ছড়িয়ে যায়। হঠাৎ ঢেকুর উঠছে, তালের বড়ার (পিঠে) গন্ধ। এক জায়গায় জাঁকজমক করে ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছে। যখনই স্মরণ করলো, 'ঠাকুর, তুমি খাও।' ঠাকুর জেনে গেলেন। এইখানকার এই ভাষা টিকটিকি, আরশোলাও জানে। আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পোকাও জানতে পারছে ৮/১০ মাইল দূর থেকে। এইভাবে অতি সূক্ষ্ম যারা, সবাই জানতে পারে।

অনিমা সিদ্ধ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এভাবেই জানেন। সেই অনিমা শক্তি সবার ভিতর রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে একহাত, দু'হাত দূর হতে যদি তোমরা জানতে পারো, পঞ্চাশ হাত দূর থেকেও জানতে পারবে। এক বিঘত দূর থেকে যা জানা যায়, লক্ষ মাইল দূর হতেও তা জানা যায়। যিনি রান্না করেন, রান্নার সম্ভার ঠিক হয়েছে কিনা, গন্ধে বুঝে জিহ্বায় দেন। গন্ধে যদি জিহ্বায় লালা আসে, ১০০/২০০

হাত দূর হতেও গন্ধ পাওয়া যায়। আর যাঁরা আরও একটু ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ১০০ মাইল দূর থেকেও বুঝেন। এক ইঞ্চি যদি বুঝতে পারে, সমস্ত ইঞ্চি বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু সকলে বুঝতে পারছে না কেন? এক একজনের সীমানা ঐ পর্যন্ত রেখে দিয়েছে। তুমি যে পার, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাছি, টিকটিকি। যেই আম, কাঁঠাল কাটলে, ভোঁ করে নীল মাছি এল। কোথা থেকে এল? পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে নৌকায় চলেছি। বর্ষাকাল, একূল ওকূল দেখা যায় না। মাঝনদীতে কাঁঠাল ভেঙেছি। কতক্ষণে? এক মিনিটের মধ্যে মাছি এসে হাজির। সে তার ক্ষুধায় এসেছে।

প্রকৃতি বলছে, এর ধারা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ তোমারই সত্তা। তোমারই আর একটি রূপ আসতে পারছে। **ঠাকুর আসনে বসেছেন, হঠাৎ জল লাফিয়ে উঠেছে। দু'শো মাইল দূরে একজন জলে পড়ে গেছে। খুঁজে দেখলেন, একজন ভক্ত জলে ডুবছে। ২০০ মাইল দূর থেকে কি করে রক্ষা করবেন? মহান (ঠাকুর) দূর থেকে সূর্যকে স্মরণ করলেন। ভক্ত গভীর জলে ডুবে যাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, সেই অতল জল হাঁটু জল হয়ে গেছে। জলের কণিকাগুলি জমাট বেঁধে গেল। এতে যে একটু সময় পেল, তাতেই রক্ষা পেল।** অথবা ভাসতে ভাসতে এমন একটা জিনিস অবলম্বন পেল, যেটা তাকে বাঁচিয়ে দিল। **মহানকে স্মরণ করার সাথে সাথে ঐ কণিকাগুলি ভাসতে ভাসতে জমাট বেঁধে বিরাট আকার নেয়। তাতে তাকে বাঁচিয়ে দেবার মত যথেষ্ট হতে পারে।**

নিদাঘের রাগে সূর্যের টানে নদী, পুকুর, খাল, বিল, সাগরের জল বাষ্প হয়ে, Vanish হয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠে আকাশের সাথে মিশে বরফের চাকা হয়ে রয়েছে। কুয়াশার ন্যায় আকাশে জলময় হয়ে রয়েছে। জলগুলি কণায় কণায় বিরাজ করছে। কয়েকটা সাগর শূন্যে রয়েছে। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয়ে পড়ছে শিলাবৃষ্টি। এত জল আকাশে কিভাবে ছিল? যেভাবে উড়ছে, সেভাবেই ছিল। কাজেই মহান দূর থেকে সূর্যকে স্মরণ করলেন। জলকণাগুলি জমাট বেঁধে হাঁটুজল হয়ে গেল। মহান তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে কতভাবে ভক্তকে রক্ষা করেন।

সবাই আমরা ফাঁকা থেকে এসেছি। এই জগৎ ফাঁকা হতে তৈরী হয়েছে। যখনই যে কোন জিনিস চিন্তা করছো, সাথে সাথে একটি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে দেহের চিন্তা দ্বারা টের পাওয়া যায় না। সৃষ্টির নিয়ম হল স্মরণ করার সাথে সাথে মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি হতে থাকে। তবে জমাট বাঁধে না কেন? একদিকে চর

বাঁধছে, অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাটিগুলো নদীর জলে ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। এই মাটি ক্রমশঃ জমাট বেঁধে বেঁধে দেশ হয়ে গেল। তুমি চিন্তা করছো, মননের সাথে সাথে তোমার চিন্তা আস্তে আস্তে জলের সঙ্গে মিশবে, ঢেউয়ের সাথে এবং স্রোতের সাতে মিশে আকাশের বাতাসের সমন্বয়ে বিরাট মাখনের মত চাকা বেঁধে যায়। ঐ ঘোলাটে জল মাখনের মত জমাট বাঁধতে থাকে।

তোমরা জপ করছো, স্মরণ করছো। আকাশকে স্মরণ করছো, গুরুকে স্মরণ করছো। নিজেকে স্মরণ করে জগৎকে স্মরণ করছো। এমনিভাবে স্মরণ করে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করছো। প্রথমে ঢেউ হতে থাকবে।তারপর এই ঢেউ তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত হবে। জেগে উঠবে নাদধ্বনি, জেগে উঠবে বিশ্বের মহাকাশের ওঁ শব্দ। যেটা স্মরণে রূপ নেওয়ার চেষ্টা করছে, তার তো একটা শব্দ আছে। ধ্বনি ছাড়া সৃষ্টি হয় না। ধনী না হলে দালান কোঠা হয় না। আবার শুধু ধনী দালান তৈরী করতে পারে না। দরকার হয় কর্মীর। দরকার হয় দরিদ্রতার। এতেই কর্মী আসে। কর্মীরা ধনের প্রার্থী। আমরাও প্রার্থী হয়ে আছি। আকাশময় ধ্বনি, গুরু গুরু ধ্বনির প্রার্থী হয়ে অগ্রসর হচ্ছি। সেই ধ্বনির সুরের ঝনঝনানির শব্দ পাচ্ছি। এই শব্দকে বলছে নুপূরের ধ্বনি। এই ধ্বনিতে কানে আঙুল দিতে হয় না। সেই ধ্বনিতে মৃগনাভী কস্তুরীর মত কান খাড়া হয়ে গেছে। কোথায়? কোথায়? কোথা হতে ভেসে আসছে এমন সুমধুর ধ্বনি? তখনই তুমি আরও বেশী স্মরণ করছো ''হে ঠাকুর, আমার তো মাথা খারাপ হয় নাই। হে গুরু, আমার বিস্মরণ হয় নাই। তবে এই ধ্বনি, এই শব্দ কোথা থেকে আসছে?'' তুমি দেখছো, এক প্রলয় সাগর। আমি সাগরের পারে দাঁড়িয়ে আছি। পারে এসে দাঁড়িয়ে দেখছো, এক মহাসাগর। তার ঝাপটা আসছে। ভীমরতি হয় নাই। অফুরন্ত সাগর ঢেউয়ের বাড়ি খাচ্ছে। আর ভিতর থেকে যেন গামছা নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে নাদ ধ্বনি উঠবার চেষ্টা করছে, ব্যথা করছে। কিন্তু এই ব্যথা এখানকার ব্যথা নয়। মনে হয়, জল আরও নিংড়াও। সংবরণের সাথে সাথে, ঘর্ষণের সাথে সাথে ফাঁকা জায়গায় সব যেন টেনে নিচ্ছে। সেই টানার ফলে বস্তুতে বেজে উঠছে। উঠছে কোথায়? সেই টানায় বস্তুতে ঝনঝন করে উঠছে। তখন এখানকার সব স্বাদ বিস্বাদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ সেথাকার স্বাদে এখানকার স্বাদ বিস্বাদ হয়ে গেছে। তাই যাঁরা বিরাট, তাঁরা এখানে থেকেও মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছেন। সেখানকার জোয়ার লেগে গেছে। কাজেই

মহানদের অবস্থা একটু অন্যর কম। তারপর মনে হয়, দেহটা যেন গলে যাচ্ছে। দেশ, পৃথিবী একদিন গলিত অবস্থায় ছিল। গলিতভাবে কোথায় তুমি আছ? দেহের অস্তিত্বগুলো আছে। সেই মাত্রাতে গলিয়ে দিল। মনে হয়, তোমার অস্তিত্ব আছে। তোমার স্মরণের সাথে সাথে মাত্রা অনুযায়ী ঐ জায়গায় মিশে যাচ্ছে।

তুমি এখানে বসেই বুঝটা ছড়িয়ে যাচ্ছ। মনে হয়, তুমি বৃহৎ হতে বৃহদাকারে ছড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার বুঝটা যেন গলে যাচ্ছে। গলে যাওয়াটাও আবার তোমার বস্তু, তোমার মাত্রা, তোমার চৈতন্য অনুযায়ী গলে যাচ্ছে, স্ফূরণ হচ্ছে। তোমার স্মরণে সেই মাত্রা গলে যাওয়ার ফলে টের পাচ্ছো, সচেতন হচ্ছ। তুমি সেই বুঝটা বুঝতে পারছো। কারণ যেই মাত্রায় গলছে, আর একটি রূপ নিয়ে মিশে যাচ্ছে। তুমি স্মরণের সাথে সাথে ভাবছো, তুমি বোধহয় মিশে গেছ। এই মিশে যাওয়ার যে পদ্ধতি, তাতে এইটুকু শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, 'বাঃ বাঃ আমি মিশে যাচ্ছি।' কিন্তু তুমি মিশে যাও নাই। স্মরণ যাতে আরো জোরদার হয়, এই মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবার জন্য সৃষ্টির নিয়মাবলী অনুযায়ী সব চলছে। তাই প্রতিটি চিন্তাই কাজে লাগে। কিন্তু তোমার চিন্তাধারা যদি একটার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যায়, তবে অধিক ফলপ্রসূ হয়।একলক্ষ টাকা দশ লক্ষ লোককে দান করলে বটে, ভাগে আর কি পড়বে? দান ঠিকই হল, বাটে (ভাগে) যেন আটপয়সা। তাই চিন্তা একটার মধ্যে দাঁড়ায়নি বলে আমাদের হয় না। **আমাদের খরচা (চিন্তাধারা) বহুমুখী হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বহুমুখী চিন্তাতে কি হয় না? তারজন্য আরও বেশী রোজগারের (জপের) চিন্তা কর। আমাদের অসুবিধা হবে না। তোমাদের চিন্তাধারা আরও যদি ধ্বনির দ্বারা বাড়িয়ে যাও গুরু স্মরণ করে, শূন্য স্মরণ করে, তাহলে এক বছরের কাজ এক একটা দিনে পেয়ে যাবে।** কাজেই সবসময় তোমরা জপ করবে। যখনই তোমরা জপ করছো বাড়ীতে বসে, ঠাকুর, গুরু তখনই টের পান। জগতের সব কাজ এভাবেই চলেছে। তাই কাজ ভালভাবে করবে তোমরা। অদ্ভুত জিনিস পেয়ে যাবে। সামনেই সব রয়েছে। কাজ করে যাও। নাম করে যাও। সময় নষ্ট করো না। তালি দিয়ে দিয়ে কদিন চলে? নিজেরা বসে পড়। সময় এভাবে নষ্ট করো না। দিন চলে যাচ্ছে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মহানামের সম্বলই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পথের সম্বল

পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা
দোল পূর্ণিমা
১৪ই মার্চ, ১৯৬৮

প্রায় ১২ ঘণ্টা নাম হয়ে গেল। মহাপ্রভুও এইভাবে নাম করতেন। ফল হবে; যে যতটুকুই কর, একটা নামও বৃথা যাবে না। সমভাবে সমতালে অজস্র নাম এক সাথে করলে, একবারে অজস্র নাম করার ফল পেয়ে যাবে। একবার 'হরি' বললে একই সময়ে অজস্র নাম হয়ে যায়। তিন বলতে বলতে ১৫০০ হয়, চার বলতে বলতে দু' হাজার হয়, এমন সুন্দর। ঘরে বসে 'হরি হরি' করলে আর একসাথে করলে, এমন অবস্থায় অজস্র নাম অতিসহজে হয়ে যায়। কীর্ত্তনের মহিমা হচ্ছে, সবার নাম এক নাম হয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যায়। তাই মহাপ্রভু বললেন, একই সময়ে ১৬ নাম ৩২ অক্ষর কর। দর্শন, অনুভূতি এতে সহজে হয়। একেবারে প্রাণঢালা নাম করবে।

আজ পূর্ণিমার দিনে তোমরা সবাই এক সঙ্গে নাম করবে। নামের উত্তাপের মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করবে। নিজেকে উজাড় করে দেবে। জপ করবে সবসময়। নামের মাধ্যমেই তোমরা সব কাজ করবে। মহাকাশের মহানাম এই 'রাম নারায়ণ রাম'। আমরা সবাই এই নিয়ে, এটাকে অস্ত্র করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দেব; সব ভাসিয়ে নিয়ে যাব। সংকীর্ত্তনকে হাতে নেব। এর ভিতরে যে যুক্তি আছে, এটা যে বিজ্ঞানসম্মত; তা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব। এই যে হরির নাম, এর কি মাহাত্ম্য আছে, এর কি মহিমা আছে, সকলকে জানিয়ে দিয়ে যাব। নামের শক্তি কি, সবার ভিতরে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। বন্যার মত সব ভাসিয়ে দেব। **মহানামের সম্বলই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পথের সম্বল। নামের ভিক্ষুক আমরা। আমরা সত্যিকারের ঝুলনা (থলে) নিয়ে বের হবো। নামের ঝুলনা আমাদের।**

আমরা জ্ঞানভিক্ষু। ভিক্ষার অর্থ ঝুলনা ভরা। আমরা ঝুলনায় নেব নাম, প্রেম, জ্ঞান। এরই ভিক্ষায় আমরা বের হবো। দেশে ভিখারী রাখবো না। চাল ডাল ভিক্ষা করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। সব সমস্যার সমাধান নামের মাধ্যমেই হবে। সব একাকার করে দেব।

আমাদের মধ্যে কোন মান অপমান থাকবে না। আমরা হাতে লাঙ্গল নেব, আবার ঝাড়ুও নেব। আমরা সব কাজকে যেন সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারি। আমরা সত্যিকারের মান অপমান বুঝি না। আমরা যেন সকলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আমরা সেইভাবে নাম করবো। আমাদের বাড়ি সকলের বাড়ি। আমাদের বাড়ি সর্বত্র— শ্মশানে, মাঠে সর্বত্র। আমাদের মৃদঙ্গের সুর যেন সেইভাবে সকলের কাছে পৌঁছে যায়। সবার ধ্বনি একত্রিত করে দেশ যেন ভাসিয়ে দেয়। এক ফোঁটা, এক ফোঁটা করেই হয় অজস্র ফোঁটা। অজস্র ফোঁটার কি দাম। এই **সন্তানদলের ইচ্ছাতে জগৎময় নামের বন্যায় সব ভেসে যাবে। এর মধ্যে কেউ আসতে পারবে না। আমরা প্রকৃতির স্বচ্ছ গতির সাথে আমাদের মনের গতি, এক গতি করে নেব।** প্রকৃতি থেকে যেভাবে দেশ ও জাতির সেবা করছে, আমরা সেভাবেই সেবার আদর্শ গ্রহণ করবো।

প্রকৃতি বিজ্ঞ এবং সচেতন। সচেতন আছে বলেই কোন কিছু দিতে কার্পণ্য করছে না। এই প্রকৃতিকেই কেউ বলে ভগবান, কেউ বলে নারায়ণ। এই প্রকৃতি পুরুষ, বিশ্ববিরাট নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন জীবের কল্যাণে। যেখানে যা প্রয়োজন, মীমাংসার এমন বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। দেহের মাঝে যেখানে যা দরকার, যেখানে নখ দরকার, যেখানে চুল দরকার, নাক, কান— সব কিছু সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাঁরই সন্তান। আমরাও যদি সেইভাবে কাজ করি, নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করবো। এভাবে জলদান করতে হবে, এভাবে খাদ্য তৈরী করতে হবে, এভাবে খাদ্য বাড়াতে হবে— সকলে মিলিতভাবে একটা সুচিন্তিত ধারায় কাজ করে যাব। নূতন করে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। যা আছে তাই বাড়ানোর ব্যবস্থা করবো। প্রকৃতির জিনিস নিয়েই আমরা নাড়াচাড়া করবো। আমরা জাতির কল্যাণে, দেশের কল্যাণে সব কাজ করবো। সেই নিয়ম পালন করবো। আমাদের সর্বশক্তি আছে বলেই প্রকৃতি-

পুরুষ যেইভাবে করে যাচ্ছেন, সেইভাবেই আমরা দেশের সেবা করবো। মহাপ্রভু যেইভাবে দ্বারে দ্বারে নাম দিয়েছেন, আমরা সেই আদর্শ গ্রহণ করবো। আমরা মাটির মানুষ, যা ভুল ত্রুটি দ্বন্দ্ব আছে, নিজেদের মধ্যে সংশোধন করে নেব।

মহাশূন্যে মহাকাশে কত সাগরের জল জমা হয়ে আছে। বৃষ্টিধারায় সারা দেশ ভাসিয়ে দিতে পারে। বৃষ্টির ধারা সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে না। বৃষ্টি এদিকে না পড়ে, ওদিকে পড়তে পারে। কিন্তু তার পতন শক্তিকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। আমাদের ভিতরেও সেই শক্তি আছে। আমাদের গতিকে কেহ নষ্ট করতে পারে না। তবে আমাদের গতিপথে বাধা আসতে পারে, অন্তরায় আসতে পারে। আমরাই যেন মাটির পুতুল হয়ে তৈরী হয়ে রয়েছি। **আমাদের পূজা আমরাই করবো। আমরা দেশের দশের পূজা করবো। ত্রিশূল হাতে নিয়ে এগিয়ে যাব। পূর্ণ চাঁদের মতো যাতে সকলের অন্তর স্বচ্ছতায় ভরে ওঠে, সেভাবে পূর্ণ হয়ে সবাই ফুটবে, জাগবে, তার চেষ্টা করবো।**

অন্তর্যামিত্বহীন দেশে অনেক গুছিয়ে চলতে হয়। তবুও লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের মধ্যে যেন কোন বাধা, কোন অন্তরায় না আসতে পারে। আমাদের ভিতরে প্রেম ভালবাসার মধ্যে যেন কোন গল্‌তি না থাকে। অন্য অন্য সম্প্রদায় বাধার সৃষ্টি করছে। আমরা আমাদের মনোবলে সব বাধা অন্তরায় উড়িয়ে দেব। আজ মহাপ্রভু জন্ম নিয়েছেন। আজ তাঁর জন্মদিন। অন্তরের দিন আজ। তোমরা একমনে নাম করেছ। তিনি এসেছেন। সব দেখছেন, বুঝছেন। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তোমরা অগ্রসর হয়েছ। এটা দেখে উনি খুশী হয়েছেন। তোমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। এই হাততালিই তোমাদের মৃদঙ্গ। তোমরা এইভাবেই নাম করে যাবে। নামের শক্তিতে নামের আলোতে তোমরা যেন পূর্ণচন্দ্রের মত বিকশিত হয়ে উঠতে পার; সব বাধা অতিক্রম করতে পার। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শিব, বিষ্ণু দুই হাত একত্র করে দেবর্ষিকে দান করলেন এই মহানাম

সুখচর ধাম
২০শে জানুয়ারী, ১৯৭১

কেন এই সৃষ্টি? কি তার উদ্দেশ্য? শুধু জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া, শুধু রোগে শোকে জর্জরিত হয়ে, সন্তান-সন্ততির জন্মদান করে তাদের লালন-পালন করে যাওয়াই কি এতবড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য? এরজন্যই শুধু এইটুকুর জন্যই কি চন্দ্র, সূর্য, জল, মাটি, আলো, বাতাস এত সুন্দরভাবে আমাদের সেবা করে চলেছে? তাতো হতে পারে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, কেন এই সৃষ্টির ধারা চলেছে, গভীরভাবে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। আমাদের বুঝে নিতে হবে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এই জগতের কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। ক্ষণিকের আনন্দে, ক্ষণিকের মোহে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে সবাই। **নারী পুরুষের মিলনে, ক্ষণিকের সঙ্গমে তৃপ্তির ফোঁটা ছিটিয়ে রাখা হয়েছে এই জগতে। সেই ক্ষণিকের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হবার জন্য জীবকুল আজ দিশেহারা। তার জন্যই যত ভুলবুঝাবুঝি, ছল চাতুরী, কলকৌশল, মারামারি, হানাহানি খুন জখম ইত্যাদি।** আর ওদিকে যে আনন্দের সাগর রয়ে গেছে; পৃথিবীতে শুধু মিলছে সাময়িক আনন্দ। খুশীর জোয়ারে একবিন্দু শুধু দেওয়া হয়েছে, যাতে বুঝতে পারে, কি অপার আনন্দের সাগর রয়ে গেছে সেই চিদানন্দধামে। পুরুষ প্রকৃতির তথা শিব শক্তির অপূর্ব মিলন, আজ্ঞাচক্র সহস্রারের মিলন ব্যাখ্যার অতীত। নির্বাণ, নির্বিকল্প সেখানে ছোট হয়ে যায়। জীবজগতে সকলেই আত্মহারার বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া। ইউনিভার্সের বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া মন। তাকে দিচ্ছ ছাগলের খোরাক। তাই যত অশান্তি, বিবাদ, অনুতাপ, অনুশোচনা। এই গণিত না মেলা পর্যন্ত দুর্ভোগ, অশান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। জীব ভুলে যাচ্ছে এই বিন্দুর আনন্দ কোথা থেকে আসছে? সেই

সরগমের দিকে, বিন্দু থেকে সিন্ধুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যখনই মহাকাশের মহানামের সুরে টান দেবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। গতির মধ্যে আছ কিনা, ভাববার কিছু নেই। টেনে নিয়ে যাবেই।

মহাকাশের সুরে থাকলে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। অতি সহজ পথ। বুঝতে পার বা না পার, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সেই ধ্বনিটা সব সময় কর। বাচ্চা শিশুর ভাষা শেখার মতো পরিবেশই সব শিখিয়ে দেবে। মনের চঞ্চলতা, বিক্ষিপ্ততায় কিছু আসে যায় না। ঐ চঞ্চল মনের ভিতর দিয়েই বাচ্চা শিশুর মত অসীমের ভাষা শিখে নিতে পারবে। বেদ দখল করার জন্য, বেদকে আয়ত্ত করার জন্য এই অসারটুকুই (অনুশোচনা, অশান্তি ইত্যাদিই) বেদের সার। **পূর্ণের বস্তু নিয়েই তোমাদের জন্ম। বিন্দুকে কেন্দ্র করেই বিরাটের পথে যাত্রা করতে হবে। বিন্দুতে ডুবে থাকলে, ক্ষণিকের মোহে মোহগ্রস্ত হলে দেরী হয়ে যাবে।** কেউ ডুবে থাকতে পারবেনা। তবে দেরী হয়ে যাবে। পরিবেশের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দাও; আপনি ভাষা শিখে নিতে পারবে। আপনি সব শিখে যাবে। পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সেই ধারাতে সবাইকে একত্রিত করতে হবে।

'রাম নারায়ণ রাম' এই নামের সুর অসীম অনন্ত স্বচ্ছতায় ভরা। একে খুঁজে পাওয়া যায়, আবার পাওয়া যায় না। কিন্তু চর্চা করলে অর্থ পাওয়া যায়। অনন্ত মহাকাশের মহাশক্তির গুণ ও নাম হিসাবে 'রাম নারায়ণ রাম' মহানাম ব্যবহার করা হয়েছে। বেদের চরম ব্যাখ্যা ও আখ্যা আছে 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের ভিতর। বিষ্ণু ও শিব মিলিত হয়ে নারদকে বললেন, 'রাম নারায়ণ রাম' মহানাম। বিষ্ণুর 'রা' ও 'ম'-এর অর্থ বোঝাতে লাগলো চারমাস, 'রা'-র টান দিতে গিয়ে লাগলো আড়াই মাস। 'রা'-এর মানে করতেই সমস্ত সূর্য, সমস্ততেজ ও বিভিন্ন রং-এর স্পন্দন হতে লাগলো। এক একটি রং-এর মাহাত্ম্য, মহিমা বর্ণনা করতে করতে 'রাম'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিষ্ণু আত্মহারা হলেন। এই অবস্থা অবর্ণনীয়, বলে বুঝানো যায় না। শিবের জটার ধারায় সেই ব্যাখ্যা শুরু হয়ে গেছে। আজও সেই ধারা চলছে। এই মহাগঙ্গার ধারা হচ্ছে অনন্ত ধারা। নারায়ণের ব্যাখ্যা অপূর্ব। গ্রহগুলি, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ, এক একটি গোলাকার, বিরাট বিরাট গোলাকার। পৃথিবী গোলাকার। মস্তক গোলাকৃতি, 'নারায়ণ'-এর প্রতীক গোলাকার।

তাঁকে আয়ন অর্থাৎ আহ্বান করা হচ্ছে। অসীম অনন্ত শূন্যে মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ আবহমান কাল থেকে আবর্তিত হয়ে চলেছে। মহাশূন্যে আপন আপন কক্ষপথে গ্রহগুলির, জ্যোতিষ্কগুলির গোলাকারে আবর্তনের এই স্রোত চলেছে অনাদি অনন্তকাল। সূর্যের মত শত শত আলোকপিণ্ড তেজ বিকিরণ করে চলেছে। অগণিত সূর্যের, নক্ষত্রের সেই আলোকধারার বিবরণ, নারায়ণের বিবরণ শোনাতে বোঝাতে শত শত বর্ষ ধারা চলে গেছে। কালের স্রোতে এই অগণিত বর্ষের হিসাব হয় না। মনে হয় যেন এক ঘণ্টা। শিব ও বিষ্ণু দুই হাত একত্র করে দেবর্ষিকে দান করলেন এই মহানাম 'রাম নারায়ণ রাম'। দেবর্ষি একশত বৎসর দাঁড়িয়ে শুনলেন 'রাম নারায়ণ রাম'-এর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাই 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের শেষ কথা নয়। যত শুনবে ততই মনে হবে নূতন ব্যাখ্যা, নূতন আখ্যা; নব নব বর্ণনায় অবর্ণনীয়। **শিব বিষ্ণুই দেহ ধারণ করে আসেন জীবের মাঝে এই মহানামের মহাধ্বনি শোনাতে।**

অনন্ত মহাশূন্যে সাধু, গুরু কেউ নেই। সবাই এখানে পথিক, সবাই যাত্রিক। আমি শুধু সেখান থেকে মহানামের ধ্বনি কুড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিলাম। জীবন অবসান হয়ে যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। তোমরাও সেইভাবে রাধার মত 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের সুরে বিভোর হয়ে যাও, আত্মহারা হয়ে যাও। নামের গভীর নিনাদে ডুবে যাও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫